প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অষ্টম বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০১৮

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2018; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

অনুসন্ধান

গণতন্ত্রের শেকড় সন্ধানে ৯
বদরুল আলম খান

সংকট

গণতন্ত্রের বৈশ্বিক সংকট : পটভূমি, প্রকৃতি ও পথরেখা ৩৫
আলী রীয়াজ

প্রাতিষ্ঠানিকায়ন

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়ন ৫৭
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান

পথরেখা

কোন পথে বাংলাদেশ ৭৭
সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের উন্নয়ন পথরেখা : ব্যতিক্রমী অর্জনের প্রেক্ষাপটে আগামীর চ্যালেঞ্জ ৯৭
মোস্তাফিজুর রহমান

বাক্‌স্বাধীনতা

এশীয় মূল্যবোধ ফিরে দেখা : ইন্টারনেটের ব্যবহার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ১০৯
ফেই শেন ও লোকমান সুই

বইআলোচনা

সমকালীন বাংলাদেশের নির্মোহ এক গল্প ১৩৫
প্রতীক বর্ধন

লেখক পরিচিতি ১৪৭

প্রকাশিত প্রবন্ধ

প্রতিচিন্তায় গণতন্ত্র ১৫১

রাজনৈতিক উত্তেজনা, আলোচনা, আশা-নিরাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদপূর্ণ সংলাপ চলমান। এ রকম একটি সময়ে *প্রতিচিন্তা*র ২৪তম সংখ্যা নিয়ে পাঠকের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই *প্রতিচিন্তা*র এবারের সংখ্যা সাজানো হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি-সংক্রান্ত নানা বিশ্লেষণের ধারা-উপধারা মিশিয়ে। এত কিছুর মধ্যেও পুরো সংখ্যাটির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে গণতন্ত্রবিষয়ক আলোচনা। গণতন্ত্রের দেশীয় ও বৈশ্বিক সংকট, তার উৎস খোঁজা, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথরেখা, বাক্‌স্বাধীনতা ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রাধান্য পেয়েছে এবারের সংখ্যায়।

*প্রতিচিন্তা*র এবারের সংখ্যাটি শুরু হয়েছে বদরুল আলম খানের লেখা দিয়ে। তার লেখায় উঠে এসেছে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শেকড়ের সন্ধান। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাত ও গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে বিবদমান আলোচনার উৎস তিনি খুঁজেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ধর্ম, মতাদর্শ, রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ এই লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ধরন ও তার কারণ।

গণতন্ত্রের সংকট আজ শুধু বাংলাদেশের একক সমস্যা নয়। পৃথিবীজুড়েই গণতন্ত্র নামক ধারণার বিরুদ্ধ-ধারণার পদচারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। উন্নত বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত দেশ থেকে শুরু করে মোটামুটি গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত দেশেও গণতন্ত্রের সংকট আজ বাস্তবতা। সেই প্রেক্ষাপটে আলী রীয়াজ তাঁর লেখায় তুলে এনেছেন গণতন্ত্রের বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপট, এর ধরন ও ভবিষ্যৎ। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের ঢেউ হিসেবে পরিচিত যেসব জোয়ার এসেছিল, সেগুলোয় ভাটার টান লেগেছে।

আলোচনার তুঙ্গে রয়েছে 'হাইব্রিড রেজিম'-এর ধারণা। গণতন্ত্রের সংকটের ইতিহাস ও এই সংকটে পর্যবসিত হওয়ার কারণ এ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়।

গণতন্ত্র ও এর সংকট নিয়ে আলোচনা করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয় একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। কার্যকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা ছাড়া গণতন্ত্র সুসংহত করার অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাই গণতন্ত্র কেন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা গেল না, তা আলোচনা করা প্রয়োজন। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান এ-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ নিয়েই হাজির হয়েছেন এবারের সংখ্যায়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়ন নামক প্রবন্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান ও ভূমিকা পর্যালোচনা করেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। প্রাতিষ্ঠানিকায়ন ছাড়াও নির্বাচন, সংসদ ও রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ জায়গা করে নিয়েছে এই আলোচনায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনকাঠামো। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের শক্তিশালী এক প্রপঞ্চ ছিল এই অন্তর্ভুক্তির ধারণা। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পার হওয়ার পরও আজকের বাংলাদেশ সেদিকে হাঁটছে দাবি করা যাবে না। কেন বাংলাদেশ সেই প্রতিশ্রুত পথে এগোতে পারল না? এই সংকটের গূঢ় নিহিত রয়েছে ধর্মসংক্রান্ত রাজনীতির মধ্যে। সাঈদ ইফতেখার আহমেদ এই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন আজকের বাংলাদেশকে ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে। হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমঝোতা ও আপসরফার পর বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি নতুন মাত্রা পেয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম বড় দল বিএনপির সঙ্গে যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদী শক্তি হিসেবে পরিচিত জামায়াতে ইসলামীর সখ্যের পর অনেক পানি গড়িয়ে হেফাজত-আওয়ামী লীগ গাঁটছড়া আজ ধর্মীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্রে প্রবেশ করেছে। সাঈদ ইফতেখার আহমেদের আলোচনায় তাই প্রাধান্য পেয়েছে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন এবং এর সঙ্গে ইসলামপন্থী রাজনীতি ও উন্নয়নের সম্পর্ক।

উন্নয়নের ধারণার প্রসঙ্গ উঠলেই বর্তমান সরকারের অনেক সাফল্যের কথা স্বাভাবিক কারণেই টানতে হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য আজ আর কোনো রূপকথা নয়। রাজনৈতিক সংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশের এই ঈর্ষান্বিত হওয়ার মতো আর্থসামাজিক উন্নয়ন সত্যিই বিশ্বব্যাপী এক বিস্ময়। এই উন্নয়ন নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। কিন্তু যে কারণে বাংলাদেশের এই উন্নয়নকে বলা হচ্ছে প্যারাডক্স বা আপাত-স্ববিরোধী, তার রয়েছে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। সামনের দিনে প্রতিটি খাতে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা না করতে পারলে উন্নয়নের সাফল্য ধরে রাখা যাবে না। অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে এই ব্যতিক্রমী অর্জন তুলে আনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলা করার পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গণতন্ত্রের সংকটবিষয়ক আলোচনার অন্যতম দিক হলো বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সংবিধানে মানুষের এই স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি পাস হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বেশ কিছু ধারা সংযোজন করা হয়েছে। এগুলোকে মোটাদাগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে দেশের সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহল মনে করে। এগুলো সংশোধনে তারা ক্রমাগত দাবি জানিয়ে এসেছে এবং রাস্তায় নেমে প্রতিবাদও জানিয়েছে। কিন্তু খসড়া আইনটি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত আইন আকারে পাস হয়েছে।

বাক্স্বাধীনতা-বিষয়ক আলোচনায় এশীয় মূল্যবোধ-সংক্রান্ত বিতর্ক বেশ পুরোনো। এশীয় মূল্যবোধের সঙ্গে বাক্স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার স্ববিরোধ আছে বলে অনেক বিশ্লেষক ও গবেষক মনে করেন। কিন্তু এসব বিতর্কের বেশির ভাগই যখন সূচিত হয়েছে, তখনো তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মতো নতুন গণমাধ্যমের বিস্তার ঘটেনি। তাই এশীয় মূল্যবোধ ধারণ করা এশীয় জনগোষ্ঠী নতুন যুগ ও বাস্তবতায় সামগ্রিকভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে কেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তা পুনরায় আলোচনার দাবি রাখে। ফেই শেন ও লোকমান সুই নামক হংকংয়ের দুজন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক এ-সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন বিখ্যাত *এশিয়ান সার্ভে* পত্রিকায়। এশীয় মূল্যবোধ ফিরে দেখার মাধ্যমে এই প্রবন্ধে ইন্টারনেট ব্যবহার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে এশীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর মতামতের বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। ১১টি এশীয় দেশে গবেষণার জরিপ পরিচালনা করেছে ইউগভ নামক একটি ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ইংরেজি থেকে লেখাটি অনুবাদ করেছেন খলিলউল্লাহ্।

সবশেষে বলা যায় যে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অনেক অর্জনের পাশাপাশি রয়েছে পর্বতসম চ্যালেঞ্জ। এই রাষ্ট্রের মূল্যায়নের জন্য অতীতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন, অতীতমুখী হওয়া নয়। বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজে বিগত দিনগুলোয় পরিবর্তনের যেসব ছোঁয়া লেগেছে, তার নির্মোহ বিশ্লেষণ পারে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিগন্ত উন্মোচন করতে। বাংলাদেশবিষয়ক গবেষক ডেভিড লুইস তেমনই একটি প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন তাঁর *বাংলাদেশ : পলিটিকস, ইকোনমি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি* গ্রন্থে। সেখানে তিনি বাংলাদেশের অর্জনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে বাংলাদেশ ক্রমেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের ব্যর্থ রাষ্ট্রের তকমার একরকম সংশোধনী দিয়েছেন বলা যায়। পাশাপাশি এ দেশের নতুন প্রজন্মের ওপর আলোকপাত করে তিনি ভবিষ্যতের বাংলাদেশের চিত্র এঁকেছেন। নতুন মধ্যবিত্তের হাতে কীভাবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেই ছাঁচে ফেলে বইটি পর্যালোচনা করেছেন প্রতীক বর্ধন।

গণতন্ত্রের শেকড় সন্ধানে

বদরুল আলম খান

এক

গণতন্ত্র নিয়ে আলাপ? কী প্রয়োজন? মাঝেমধ্যেই ভাবি। সংশয়টি বাংলাদেশের অতীতের দিকে তাকিয়ে। অভিজ্ঞতা সেখানে খুব যে ভালো, তা তো নয়। সংঘাত, মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি কেবল রাজনীতিতে নয়, সবখানে। সামাজিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক—বাঙালির মনোজগৎটাই যেন গড়ে উঠেছে সংঘাতের বীজ দিয়ে। এ সবই গণতন্ত্র যা নয়, তাই। এই বিশেষ মানসিক প্রবণতা যদি ইদানীংকালের ভাবি, তাহলে ভুল হবে। কুগুণটি বাঙালির মনে শিলায়িত হয়েছে বহু আগে থেকে। দুটি বিশেষ শক্তির আন্তপ্রভাব সম্ভবত এর জন্য দায়ী। একটি এদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু ও আবহাওয়া। সঙ্গে যোগ হয়েছে তার আধ্যাত্মিক বা বিশ্বাসের জগৎ, অর্থাৎ ধর্ম। দুইয়ের সমন্বয়ে বাঙালি মন বিদ্রোহ করতে একেবারে মুখিয়ে থাকে।

মোগল শাসনের পুরো সময় ধরেই কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা অগণিত বিদ্রোহ ঘটিয়েছে। ইংরেজ শাসনেও তার নিষ্কৃতি মেলেনি। আর পাকিস্তানের অধীনেও ওই একই চিত্র—শান্তিপূর্ণভাবে কোনো প্রাপ্তি কোথাও কখনো আসেনি। বিদ্রোহ করতে হয়েছে। তবে যদি ভাবি, বাঙালির মন বিশুদ্ধ বিদ্রোহ দিয়ে তৈরি, তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। এই মন থেকে গোলামির অভ্যাসটা যায়নি, যদিও মোগল প্রভুরা বিদায় নিয়েছে, ব্রিটিশরা গেছে, পাকিস্তানকেও তাড়ানো সম্ভব হয়েছে। গোলামির পল্লবিত শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে যায়নি। সে কারণে কেউ যদি বলেন, বাঙালি চরিত্রে একদিকে সংঘাতী তেজ, আবার প্রয়োজনে একেবারে অনুগত গৃহপালিত প্রাণী, তাহলে ভুল হবে না। দুইয়ের মিশেল এখানে এমনই যে দেখে মাঝেমধ্যে মনে হয় এ যেন ল্যান্ড অব দ্য অ্যাবসার্ডে বাস করা।

তবে একটু আশার আলোও দেখতে পাচ্ছি। ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে এই প্রথমবার দেশ নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে কোনো সংঘাত ছাড়াই। সাম্প্রতিক অতীতেও রাজনীতিতে তিক্ত পরিবেশের অভাব ছিল না। ১৯৯১ সালে স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলনের পর নির্বাচন হলো কী দুর্যোগের মধ্যে। ১৯৯৬ সালেও প্রথমে সংঘাত, রক্তপাত, তারপরই না নির্বাচন। ২০০১, ২০০৮ সালেও চিত্রটি পাল্টাল না। ২০১৪ সালের নির্বাচনে একেবারে অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। বিরোধী দল অতীতের দিকে তাকিয়ে ভাবল, নির্বাচন বর্জন, জ্বালাও-পোড়াও বেশ কার্যকর পন্থা। আগে কাজে দিয়েছে, এখন দেবে না কেন? সেই পথই অনুসৃত হলো। সরকারের পতন আসন্ন, আর সেই সঙ্গে ক্ষমতা ফেরত। চলল জ্বালাও-পোড়াও। আগুনে মানুষের দেহ ঝলসাল, কিন্তু ছকটি আগে কাজে দিলেও এবার কিন্তু ফল হলো উল্টো। জ্বালাও-পোড়াও করে জনগণের মন পাওয়া তো দূরে থাক, মানুষ এর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। কখনো নীরবে, কখনো সরবে। সরকারের পতন-ভাবনা বাদ গেল। মাঝখান দিয়ে নির্বাচন একতরফা হয়েছে বলে এককালের বাম (বিশেষত জাসদ নামের কিছু ব্যর্থ বিপ্লবীর দল) আর দক্ষিণের (ধর্মীয় দলের মুখপাত্র) বুদ্ধিজীবীরা যত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক, বিরোধী দলের রাজনৈতিক ভুলটা স্বীকার করে নিতেই হলো।

কারণটা আর কিছু নয়—বাংলাদেশ বদলে গেছে। নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতির ঢেউ তার গায়ে ভিন্ন আবেশ এনে দিয়েছে। নব্য মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত এখন আর রক্তপাতে বিশ্বাস করে না। সাধারণ মানুষও বৈশ্বিক অর্থনীতির ছিটেফোঁটা যা চুইয়ে পড়ছে, তার প্রতিফল ভোগ করছে। তাই রাস্তায় নামাটা এখন আর আকর্ষণীয় প্রস্তাব নয়, এমনকি তাদের কাছেও নয়। এ উপলব্ধি আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে এল অনেক দেরিতে। কেবল খালেদা জিয়াকে জেলের তালা ভেঙে মুক্ত করার আন্দোলনে ধার পাওয়া গেল না যে তা-ই নয়, ২০১৩ সালের মে মাসে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ, ঢাকা ঘেরাও আন্দোলনে মালমসলা যতই ব্যবহার করা হোক না কেন, ঢাকাবাসীর সাড়া মেলেনি ওই একটি কারণে—অর্থনীতি। ফলে যদি সব মিলিয়ে ভাবি, তাহলে বলতেই হবে, এবারের নির্বাচনটা ব্যতিক্রমী। তবে ঘটনা কীভাবে এগোবে, অজানা। আশঙ্কা হচ্ছে, নির্বাচনসর্বস্ব গণতন্ত্রের মূল কেন্দ্র যেহেতু কয়েকটি প্রধান শহর, আর সেসব শহর যেহেতু বিশাল উদ্বাস্তু, সর্বহারা, বস্তিবাসী মানুষ দিয়ে ভরা, আর তারাই যেহেতু সন্ত্রাস আর সংঘাতের প্রয়োজনীয় মালমসলা, তখন নিশ্চিত বলে কিছুই ধরে নেওয়া কঠিন। যেকোনো ছুতোতে আগুন জ্বললে অবাক হব না।

তবে একটু সদয় না হলে হবে না। বাংলাদেশে তো গণতন্ত্রের কোনো শিলায়িত ইতিহাস নেই। এখানে গণতান্ত্রিক আদর্শের আধ্যাত্মিক বা মানসিক ভিত অত্যন্ত

দুর্বল। ব্রিটিশপূর্ব বাংলাদেশে রাজা-বাদশা, জমিদার শ্রেণির শাসন, কখনো মোগল, কখনো বাংলার নবাবের শাসন বলবৎ ছিল। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলা জাতিগতভাবে নিগৃহীত হয়েছে। তাকে পদানত রাখতে, দেশকে লুণ্ঠন করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্ম, অগণতান্ত্রিক নানা পথ বেছে নিয়েছে। পঁচিশ বছর ওই অবস্থায় কাটানোর পর কোনো গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। এরপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সামরিক অভ্যুত্থান, সামরিক শাসন ইত্যাদি পেরিয়ে এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু ১৯৯১ সালে, স্বৈরাচারী এরশাদ সামরিকতন্ত্রের পতনের পর। তবে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা বলতে নামমাত্র হাতেখড়ি নেওয়াকে বুঝতে চাই না। তার প্রতি তাত্ত্বিক আনুগত্যকেও গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরতে হয়। হাতে-কলমে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই। না হলে তার ভিতকে শক্ত করা কঠিন। গোটা সমাজ তো অনেক বড় কথা, সমাজের যেসব মূল প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আলোকে গড়ে তোলা জরুরি হলেও প্রয়োজন দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার। প্রখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, সেতার বাজানোটা একটা সাধনা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর হাতে তিনি তালিম নিতেন দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা। হাত পাকা করতে আরও ব্যয় করেছেন বহু বছর। এর পরই না সাফল্য। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সেই কথা। তবে তাকে নিয়ে আমাদের সে ধরনের কোনো সাধনার ইতিহাস নেই। অভিজ্ঞতা থেকে তো বঞ্চিত আছিই, সেই সঙ্গে আছে আমাদের যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার বাতিক।

যা-ই হোক, সংঘাতের দ্বিতীয় শিকড় কিন্তু আরও গভীরে। আমরা বারবার বলছি, আমাদের যুগ গণতন্ত্রের যুগ। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র আমাদের মতো দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তার মধ্যে সংঘাতের বীজ থেকেই যাচ্ছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের পর (১৯৯১ সাল) গণতন্ত্রের গতিশীল বিস্তার সারা বিশ্বে ঘটল। বহু অগণতান্ত্রিক দেশ মোড় পরিবর্তন করে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করল। আমরাও ওই বিশেষ রাজনৈতিক প্রবাহে যুক্ত হলাম। বার্লিন দেয়াল ভাঙল। ইউরোপ একীভূত হলো। চারদিকে গণতন্ত্রের জয়জয়কার। নানা তথ্য থেকে এর প্রমাণ এল। ২০১১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় *দ্য ইকোনমিস্ট* পত্রিকার দাবি, ১৯৬০ সাল এবং ১৯৯১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আফ্রিকার ৫৪টি দেশের কোনোটিতেই যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার রদবদল ঘটেনি, ১৯৯১ সালের পর পরিস্থিতি বদলে গেল। এক আফ্রিকা মহাদেশেই অন্তত ৩০টি দেশে ক্ষমতাসীন দলকে নির্বাচনের মাধ্যমে সরিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার এসেছে। তবে যা হয়, একলাফে তো আর গণতন্ত্রে পৌঁছানো যায় না। কিছু উত্তরকালীন সময়ের প্রয়োজন হয়। আর তাকেই গণতান্ত্রিক সাহিত্যে বলা হয় উত্তরকালীন গণতন্ত্র।

এই গণতন্ত্রের একটা সমস্যা হচ্ছে, অনেক দিন ধরে সামরিকতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রে কাটানোর কারণে গণতন্ত্রে পৌঁছাতে গিয়ে নানা সমস্যা এসে হাজির হয়। সমস্যাগুলো মূলত স্বৈরশাসনের অবশিষ্ট থেকে তৈরি। যেসব অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্বৈরতন্ত্র গড়ে তোলে, যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা একদলীয় শাসনের ঐতিহ্য সমাজে স্থান করে নেয়, সঙ্গে আরও যোগ করুন রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতি—সব মিলিয়ে এক বিশেষ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে মোকাবিলা।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মন গণতন্ত্রকে বুঝতে চায় একেবারে বিশুদ্ধরূপে। যারা তাত্ত্বিক মানুষ, তাদের অবশ্য এই সত্যটি বোঝানো কঠিন যে কোথাও কখনো পুরো ১০০ ভাগ গণতন্ত্র হয় না, সম্ভবও নয়। মার্কিন মুলুকের কথাই ভাবুন। এই তো সেখানে মিডটার্ম নির্বাচন হয়ে গেল। পত্রপত্রিকায় খবর বেরোল, যেসব রাজ্যে রিপাবলিকান গভর্নর, সেখানে নাকি নতুন ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করতে প্রচণ্ড অনীহা; বিশেষ করে কালো আর আদিবাসীদের। এরা ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দেবে—এ আশঙ্কায় রিপাবলিকানরা উঠেপড়ে লাগল। যেভাবেই হোক, বিলম্ব করে বা ভয় দেখিয়ে তাদের নিবৃত্ত করা চাই। গণতন্ত্রের এই শিখর রাষ্ট্রে নিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র তাহলে কোথায়? ২০০০ সালের কথাই ধরি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আল গোর হেরে গেলেন। হেরে যাওয়ার প্রধান কারণ ফ্লোরিডা রাজ্য। সেখানে ভোটের ব্যবস্থা কাগুজে ব্যালটে। যা-ই হোক, জোর গুজব, জেব বুশের ভাই ফ্লোরিডার গভর্নর ব্যালটে গন্ডগোল পাকিয়ে ভাইকে পাস করিয়ে এনেছেন। এ ধরনের শয়তানি-বদমায়েশি উন্নত, অনুন্নত, সিকি, আধুলি জাতের সব দেশেই যে হতে পারে, তা ম্যাকিয়াভেলির জন্মের আগে থেকেই গ্রিকরা জানত। সেই আশঙ্কায় তারা গণতন্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখায়নি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে স্বৈরাচার হিসেবে নাকচ করে দিয়েছিল।

তবে এ কথা সত্যি যে ওই উত্তরকালে অন্তত একটু হলেও বোঝা যায় দেশটি কোন পথে এগোচ্ছে—গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, নাকি দেশটি পুনরায় স্বৈরশাসনের দিকে ফিরছে। এই দুই প্রবণতার কোনটি প্রাধান্য পাবে, উত্তরকালীন গণতন্ত্র কীভাবে সামনে অগ্রসর হবে, তার সুনির্দিষ্ট পথ বাতলে দেওয়া কঠিন। এসব ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও স্বৈরাচারী উপাদান পাশাপাশি টিকে থাকে, কোনোটাকেই সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না। ফলে গণতন্ত্র মিশ্র শাসনের রূপ নেয়—বিশুদ্ধ স্বৈরতন্ত্র নয়। আবার গণতন্ত্র বলাও ঠিক নয়। তবে বিশুদ্ধবাদীরা এ ধরনের আধা পাকা, আধা কাঁচা গণতন্ত্রের ওপর যারপরনাই খ্যাপা। নানা বিশেষণে ভূষিত করার প্রক্রিয়া তাদের হাতে অব্যাহত। তাদের কেউ বলছেন, এসব Feckless Pluralism (Carothers, 2002, p.10)। কেউ বলছেন,

নির্বাচনী গণতন্ত্র (electoral democracy), মিথ্যা গণতন্ত্র (pseudo democracy) বা দুর্বল গণতন্ত্র (weak democracy), আংশিক গণতন্ত্র (partial democracy), আবরণী গণতন্ত্র (facade democracy), আধা গণতন্ত্র (semi-democratic), পোশাকি গণতন্ত্র (formal democracy), উদারনীতিবিমুখ গণতন্ত্র (illiberal democracy) ইত্যাদি (Carothers, 2002, p.10)। নামের শেষ নেই। এমনকি শ্রীলঙ্কার মতো দেশকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তার নামের পাশে বসানো হচ্ছে Frozen Democracy শব্দটি (Terry Lynn Karl, 1990)। সেন্টার ফর গভার্ন্যান্স স্টাডিজের অকেশনাল পেপার হিসেবে অক্টোবর ২০১৮ সালে প্রকাশিত আলী রীয়াজের প্রবন্ধে এসবের কিছু আভাস মিলবে। অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্রের আকার আর প্রকৃতিকে তিনি ওই দৃষ্টি থেকে নাজেহাল করেছেন অক্টোপাসের বহু বাহু দিয়ে।

তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, এখানকার নব্য এলিট শ্রেণির ক্ষমতায় আসার ধরনটি ভিন্ন ছিল। তারা নিজেদের পরিচালিত বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি—এসেছে সামরিক শাসনের কাঁধে চেপে। ১৯৭৫ সালে চিলির মতো করে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হলো। আগের ক্ষমতাসীন দলের বামঘেঁষা নীতির পরিবর্তে এল নিউ লিবারেল নীতি। সেটিই দেশের মূল অর্থনৈতিক ধারা হিসেবে স্থিত হলো। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ সস্তা শ্রম দিয়ে গড়ে উঠল পোশাকশিল্প। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক অর্থনীতি শক্তিশালী হলো। জন্ম নিল নব্য এলিট-বুর্জোয়া শ্রেণি। তবে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করলেও লাতিন আমেরিকার এলিটদের মতো আমাদের দেশের বুর্জোয়া গোষ্ঠী গণতন্ত্রের কথা ভাবেনি। তারা দোআঁশলা, আধা আঁশলা যেকোনো গণতন্ত্রেই তৃপ্ত। লুটপাট করে পুঁজি বানানোর সুযোগ তো তখনো নিঃশেষিত হয়নি। তার ছোবড়াটুকু পর্যন্ত চেপে নিংড়ে রস বের না করে ক্ষান্ত দেয় কীভাবে? ফলে গণতন্ত্রের প্রতি যতটুকু না, তার চেয়ে আগ্রহটা শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রের দিকে। পোশাকি আচরণে অবশ্য গণতন্ত্র গণতন্ত্র করতে দোষ নেই। কিন্তু প্রেমটা স্বৈরশাসন অথবা একনায়কতন্ত্রের প্রতিই প্রগাঢ়। এখানেই রয়ে গেছে সংঘাতের বীজ। যেকোনো মুহূর্তে দেশ স্বৈরশাসনে ফিরতে পারে। কারণ, তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো গ্যারান্টি নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক গ্যারান্টি নেই এ কারণে বলছি, কারণ, আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো যতই সন্ত্রাস আর মারামারিতে সিদ্ধহস্ত হোক না কেন, ভেতরে কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল। এ ক্ষেত্রে অবস্থাটা একেবারে তথৈবচ। সাংগঠনিক দিক থেকে ভাবলে একমাত্র আওয়ামী লীগের মধ্যে কিছুটা হলেও ধ্রুপদি ধাঁচের

আদি ভাব আছে। দলটি গণমানুষের মধ্য থেকে উঠে এসেছে। সংগ্রাম করেছে মানুষজনকে নিয়ে, জেল খেটেছে, কর্মীরা প্রাণ দিয়েছে। সে তুলনায় বিএনপির ইতিহাস নবীন। আর যদি ধরে নিই দলটি সামরিক অভ্যুত্থানের ফসল, তাহলে ভুঁইফোড় বলতে দোষ দেখি না। সামরিক বাহিনীর কিছু জেনারেল আর দলত্যাগী সুবিধাবাদী মুরব্বি গোছের কিছু মানুষ নিয়ে তার আবির্ভাব হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সামরিক বাহিনীর শাসনামলে তাদেরকে অলংকারের বাইরে খুব বড় কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। মান-সম্মানের কথা বাদ; বিশেষ করে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময়ে। ওই একই দশা হয়েছিল লাতিন আমেরিকায়ও। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ৮ নভেম্বর পার্লামেন্ট বাতিল করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হবে। ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সংলাপ হলো। প্রকাশ্য রাজনীতির দরজা খুলে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করল প্রায় ৬০টি রাজনৈতিক দল। এরই মধ্যে চলল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। মুসলিম লীগের শাহ আজিজুর রহমানকে প্রলোভন দেখিয়ে পক্ষে আনা হলো। আওয়ামী লীগ কয়েক ভাগে বিভক্ত হলো। মিজানুর রহমান ও মাওলানা তর্কবাগীশকে দিয়ে নতুন দল, ওসমানীর জাতীয় জনতা পার্টি, খন্দকার মোশতাকের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তৈরির পাশাপাশি ভাসানী ন্যাপের অভ্যন্তরেও ভাঙন তৈরি হলো। মসিউর রহমান এবং এস এ বারীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ জিয়াকে সমর্থন করল। পরে আর কী! জিয়ার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দিলেন। আতাউর রহমান খানের ইউনাইটেড পিপলস পার্টিও বিভক্ত। এক অংশ কাজী জাফর আহমদ, অন্য অংশ ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে একেবারে সুড় সুড় করে জিয়ার দলে। সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র, মুসলিম লীগ ও ইসলামী পার্টিও আহ্লাদে আটখানা। বাম দলও বাদ গেল না। বিভেদ ও হিংসার মনোভাব জয়ী হলো। এ ক্ষেত্রে জেনারেল জিয়া সাহেব ছিলেন সর্বপারঙ্গম। দলীয় রাজনীতির চেয়ে ব্যক্তিরাজনীতিকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু তার নিজের দল বিএনপিকে আজ ওই কর্মের খেসারত দিতে হচ্ছে।

তাহলে দাবি করা শ্রেয় যে আমাদের দেশে এলিট শ্রেণি যেমন বোদ্ধা হয়ে ওঠেনি, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোও সাংগঠনিকভাবে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় ভুগছে। সংঘাতকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বেছে নেওয়ার একটি কারণ কিন্তু এটি। কারণ, কথায় তো আছে, খালি কলসির শব্দ বেশি। গণতন্ত্রের ভাগ্য সে কারণে পেন্ডুলামের মতো একবার গণতন্ত্র, একবার স্বৈরতন্ত্রের দিকে যাওয়ার ঝুঁকি রয়ে গেছে। মনোভাবে আক্রমণাত্মক, প্রতিপক্ষের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, সংকীর্ণতা, স্পর্শকাতরতা, ক্ষমতার লোভ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের

ফল মেনে নিতে কার্পণ্য দেখানো—সবই এর চরিত্রে উপস্থিত। সুধীসমাজ প্রশ্ন তুলতেই পারে, সরকারি দল বিরোধী দলকে কেন শত্রু ভাববে, কেন এলিট সমঝোতার কোনো ধারা আমাদের রাজনীতিতে জন্ম নেয়নি, কেন অগণতান্ত্রিক, সভ্য জগতের রীতিনীতিবিরোধী আচরণ করবে। বিরোধী দলও কেন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ধরে নেবে। সমঝোতার দরজা বন্ধ, প্রতিযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে না রেখে জাতীয় সংসদ বর্জন করা, রাস্তায় নেমে সরকার উৎখাতে সহিংস পথ অনুসরণ করা—এসবের কারণে রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। ফলে গণতন্ত্রের প্রতি 'সক্রিয়, ইতিবাচক এবং গভীরভাবে অনুভূত কোনো আনুগত্য' (Diamond, L 1999, p. 64) এখানে গড়ে ওঠেনি। গণতন্ত্র এখানে নাগরিক অভ্যাসে পরিণত হয়নি। সে কারণে দেশটি ধূসর এক এলাকায় (grey area) এখনো পড়ে আছে। বিপদ সেখানে।

বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনো অত্যন্ত অপরিপক্ক। কারণ, এখানে গণতন্ত্রের কৌশলী দিক সম্পর্কে কোনো সচেতনতা নেই। ঐকমত্য ও সমঝোতা দিয়ে বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হলেও আমাদের এলিট শ্রেণি ওই বিশেষ কৌশলকে এখনো আয়ত্ত করতে শেখেনি। নানা ধরনের সমঝোতা, একপা পিছিয়ে আসা, বিরোধী শক্তির সঙ্গে কৌশলগত আপসের রাজনৈতিক মূল্য থাকলেও সামন্তবাদী একগুঁয়েমির কারণে ওই কৌশল আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়নি। অথচ তারাই কিন্তু দেশের সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। এটি দেশীয় গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। যে এলিট গোষ্ঠী বিরোধী রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অবস্থানের প্রতি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে অপারগ, তার পক্ষে প্রয়োগবাদী (pragmatism) এবং নমনীয় (flexibility) হওয়া কঠিন। তাদের চিন্তা স্থির অনমনীয় (rigid) আদর্শ দিয়ে পরিচালিত। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশ্বাস বা সমঝোতা গড়ে ওঠে না। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় ভদ্রতা ও অন্যের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত সে কারণে বিরল।

রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। দুই জনপ্রিয় নেতার করুণ মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটি প্রধান ট্র্যাজেডি হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। শেখ হাসিনা-খালেদা জিয়া দ্বন্দ্ব সেই ট্র্যাজেডির মূর্ত প্রতীক। তাঁদের জীবন ও রাজনৈতিক অভিলাষ কেবল পিতা বা স্বামীর অকালমৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রিয়জন হারানো ও তা থেকে সৃষ্ট গভীর মানসিক ক্ষতকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করায় মুজিবের মৃত্যুর কারণ হিসেবে জিয়াকে দায়ী করা হয়েছে। খালেদা জিয়াকে ক্ষমতাকাঠামো থেকে দূরে রাখা সে কারণে নৈতিক আবেগময় দায়িত্ব। জিয়ার অপমৃত্যুর কারণ মুজিব

বা তাঁর পরিবার না হলেও হাসিনাকে পরাজিত করে যা লাভ, তা হচ্ছে একধরনের আত্মতৃপ্তি। প্রপঞ্চটি বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান স্বতঃসিদ্ধ। তবে আপাত-ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও তাঁদের রাজনীতিতে জাতির আত্মপরিচয়গত সংঘাতের ছায়া প্রতিফলিত। সেই সংঘাতে মুজিবকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রক্ষক হিসেবে দেখা হয়। আর জিয়া ইসলামি বা মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মুজিব-জিয়া দ্বন্দ্ব কেবল ব্যক্তিদ্বন্দ্ব নয়, আদর্শিক রূপ নেওয়ার কারণে তার স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তার কারণ নেই।

এসব কারণে জনগণও গণতন্ত্রে শিক্ষিত হচ্ছে না। গণতন্ত্র শব্দের আদ্যোপান্ত বোঝা দূরে থাক, সিকিটুকু বোঝে কি না সন্দেহ। ফলে যা বাস্তব তা হচ্ছে, গণতন্ত্র নিয়ে যতটুকু কথাবার্তা—সবই শহুরে শিক্ষিত অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ জনসংখ্যার ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি হবে না। কিছু মধ্যবিত্ত, কিছু উচ্চবিত্ত। জানি না উচ্চবিত্তের মধ্যে গণতন্ত্র নিয়ে মাতলামিটা আদৌ নিভাঁজ কি না। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষের বাস গ্রামে। অধিকাংশই কৃষক, নাহয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, স্কুল, কলেজের শিক্ষক। রাষ্ট্রপরিচালনার মতো জটিল বিষয় নিয়ে এই অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গোষ্ঠী কি পারঙ্গম? আর যদি ধরি, রাজনৈতিক নেতাদের ম্যাকিয়াভেলি মাপের নানা কূট ষড়যন্ত্র, দেনা-পাওনা মেটানোর নানা পদ্ধতি, সুবিধাবাদী প্রবণতার ব্যাপক প্রসার—তাহলে আবহাওয়াটা আরও জটিল হয়ে ওঠে। সঙ্গে তো সামর্থ্যের প্রশ্ন রয়েছেই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মাঠে, সন্ধ্যায় পাড়ায় চায়ের দোকানে জটলা। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে দেশকে ভাবার বেশি তো নয়। টেলিভিশন পর্দা যা বলছে, তা-ই গিলে খাচ্ছে, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আবেগচালিত নানা আলাপে জড়িত হচ্ছে। এই নিয়েই তো জনতা, অধিকাংশ মানুষের সচেতনতার পরিধি। মেয়াদান্তে নির্বাচন হলো যদি, তাহলে কিছু ক্ষণিক উত্তেজনা। সেখানেও ভাসমান জনগোষ্ঠী বুদ্ধি খাটিয়ে গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক পর্বগুলো সম্পন্ন করবে কীভাবে? সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা তো তাদের হাতে নেই। নির্বাচনে ভোট কোন দিকে দিতে হবে, নির্ভর করবে গোত্র আনুগত্য, পারিবারিক প্রভাব, দুই কাপ চা, হাতে কিছু অর্থ—এই হলেই হলো। যেখানে যাওয়ার কথা, ভোট সেখানে যাবে। এই জনগোষ্ঠীর তেমন কোনো সংগঠনও নেই। থাকলেও ব্যক্তি-আধিপত্য সেখানে টনটনে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জয় হলো—এই নিয়ে বড়াই করার কী আছে? জনগোষ্ঠী কি সার্বভৌম? ক্ষমতার উৎস কি তারা? গণতন্ত্রের ঘাটতির এটি এক দিক (democratic deficit)।

জনগণের মনোজগতে গুণগত পরিবর্তন আনতে হলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে হবে, যেটি আমাদের দেশে প্রকটই বলব। ওই বৈষম্য না কমলে মানুষের মধ্যে আন্তসম্পর্ক সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হয় না। সামাজিক

ও রাজনৈতিক বৈষম্যকে এমন পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন, যেন মানুষ তার কারণে রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার না হয়। এ দিকটি নিশ্চিত করা গেলে মনস্তাত্ত্বিক উন্নতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পথটি সবার ক্ষেত্রে সহজ হয়। গণতন্ত্রের দিকপাল রুশো কিন্তু এ কথাটিই বলেছিলেন। সে কারণে সমাজে কোনো গোষ্ঠীকে অতিমাত্রায় ধনী হিসেবে রুশো দেখতে চাননি। অতিমাত্রায় ধনিকগোষ্ঠী অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়, অর্থের বিনিময়ে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব খাটাতে পারে।

সম্পত্তির মালিকানাকে রুশো গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে ভেবেছেন, সে মালিকানা যত সীমিত হোক। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সবই আদর্শিক কথাবার্তা। সে কারণে বড় ধরনের বাধাও বটে। ফলে গণতন্ত্রকে যদি এলিট শ্রেণি এবং জনগণের মধ্যে 'টাগ অব ওয়ার' হিসেবে দেখি, তাহলে জনগণের ক্ষমতাকেন্দ্রিক আন্তসম্পর্কটা কিন্তু এলিটের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তা ভারসাম্যহীনভাবে। ফলে জনগণের দুই ধরনের ক্ষমতা থাকলেও কিছু এসে যায় না। যে ক্ষমতাকে বলে ডি ফ্যাক্টো, সে তো সবারই আছে। আর যাকে বলি ডি জুরি ক্ষমতা, সেটি হস্তান্তরিত হলেও কিছু এল গেল না। প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণ এলিট শ্রেণির হাতে ক্ষমতা তুলে দিল ঠিকই। এলিটও দেশ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করল। ক্ষমতা হস্তান্তর করে জনগণ ভাবল, এবার নিশ্চয় কল্যাণ হবে। কিন্তু ক্ষমতার কথা ছেড়েই দিলাম, তার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা বা পারদর্শিতা যেটি গণতন্ত্রের মোদ্দাকথা, সেখানেও জনগণ একেবারেই সর্বহারা।

সব মিলিয়ে আমাদের ভাবনাবিন্দু যদি এলিট শ্রেণি হয়, তাহলে তার অপরিপক্বতা দূর করার দিকটি নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। দুই ইতালীয় চিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি বা প্যারেটো কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁদের সেই তত্ত্ব, যাকে বলি এলিট তত্ত্ব, সেটি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। তাঁরা উভয়ে এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন দুটি অর্থে। একটি ব্যাপক অর্থে, যেখানে সমাজের সব এলিটকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে এলিট বলতে প্যারেটো দেখেছেন ক্ষুদ্র এক গ্রুপকে, যারা কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে এবং পেশার স্তরবিন্যাসে সবচেয়ে উঁচু স্থানে অবস্থান করছে। ব্যবসায়ী, আর্টিস্ট, সফল রাজনীতিবিদ, প্রফেসরের মতো পেশাজীবী মানুষ ব্যাপক অর্থে এলিট। তবে এই এলিটদের গুরুত্ব কম। সংকীর্ণ অর্থে এলিট বলতে সরকারি বা রাজনৈতিক এলিটকে বোঝায়। তারা সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে সমাজের ধরন নির্ভর করে এই ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠীর চরিত্র এবং রাজনৈতিক পারদর্শিতার ওপর। এলিট শ্রেণির এই অংশ বৃহৎ অংশ এবং বাকি জনগণকে শাসন করতে পারে দুটি উপায়ে। একদিকে

শক্তি ব্যবহার করে, অন্যদিকে ছলনা দিয়ে। সেদিক থেকে রাজনৈতিক এলিটকে দুই গোত্রে বিভক্ত করা যায়। যারা শক্তি প্রয়োগে শাসন করে, তারা সিংহ পরিবারে অন্তর্ভুক্ত। যারা চাতুর্য এবং ছলনা দিয়ে শাসনের ক্ষমতা রাখে, তারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শৃগাল পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে এসব উপমা বা প্রতীকী চিত্রের পেছনে প্যারেটোর মূল বক্তব্য হচ্ছে, এলিট সমঝোতা, যাকে তিনি বলেছেন the instinct for combination, সেটি যদি সম্ভব হয়, তাহলে এলিট শ্রেণির মধ্যে সংযতাচার (moderation), আপসরফার মনোভাব (accommodation) চুক্তিতে পৌঁছাতে আলাপ-আলোচনার (bargaining) সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনাকে বাতিল করতে পারি না। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এলিট শ্রেণির এই দক্ষতাকে স্বাভাবিক এক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখে। আমাদের দেশের এলিট শ্রেণি ওই দক্ষতা থেকে অনেক দূরে। দলগত সংঘাত ও আন্তদলীয় তিক্ততা মিটিয়ে ওই দক্ষতা অর্জন করতে পারলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হতে পারত।

দুই

উদারনীতির ধারাটি নানা কারণে আমাদের সমাজে গড়ে ওঠেনি, যার ওপর ভরসা করে গণতন্ত্রের মতো কোনো প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থার কথা ভাবা যায়। সেটি সম্ভব না হওয়ার পেছনে অতীতের যোগ-সম্পর্ক রয়েছে। উদারনীতিবাদী দর্শনের সঙ্গে বাংলা পরিচিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়। ওই সামাজিক ও দার্শনিক আন্দোলন মানুষের মধ্যে সম-অধিকারের দাবির স্বীকৃতি দিলেও ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেকে দূরে রাখার কারণে মুসলমান সম্প্রদায় ওই আন্দোলনের মর্মবাণীকে আত্মস্থ করেনি। ফলে মুসলিম সমাজের ওপর ওই আধুনিক জ্ঞানপ্রবাহ বিশেষ কোনো প্রভাব রেখে যায়নি। বাংলার রেনেসাঁ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান বা হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ইতিহাসের নানা উদ্ধৃতি থাকায় মুসলমান সমাজ ওই আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কিন্তু হিন্দু চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত হলেও ওই আন্দোলনের মধ্যে মানবিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যেসব উপাদান ছিল, সেগুলো মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করা যেত। বাংলার হিন্দু সমাজ ওই আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তা পুরোটা আত্মস্থ করল। মুসলমান সমাজ তা থেকে বঞ্চিত হলো। ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় রাজা রামমোহন রায়ের মতো মানুষ সতীদাহ নিবারণ করেছিলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য, রাজনীতি ও দর্শনে উদারনীতির নানা ধারা এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতি স্থান করে নিয়েছিল। তার অর্থ হচ্ছে, হিন্দু সমাজ সনাতনী ধর্মের সামাজিক অনুশাসনের অনেকগুলোকে চ্যালেঞ্জ

করেছে এবং পরিবর্তন এনে উদারনীতির বিকাশকে এগিয়ে নিয়েছে।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ওই আন্দোলনের মূলে যে বিশেষ শ্রেণি সক্রিয় ছিল, তারা উদারনীতিবাদের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এদের অনেকেই ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছে। পরমতসহিষ্ণুতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপনিবেশ-ব্যবস্থাকে অবৈধ মনে করলেও তার ফলাফলকে তারা সম্পূর্ণ নাকচ করেনি, বরং তার সংস্কারের পক্ষে মত দিয়ে অতীতের অনেক কিছু গ্রহণ করে সমাজজীবনে তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ ঘটিয়েছে। সম্ভবত সে কারণেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদারনীতিবাদী এবং উগ্র ধারার (কমিউনিস্ট, সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে গড়ে ওঠা নানা রাজনৈতিক গ্রুপ) মধ্যে উদারনীতিবাদ প্রধান ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। দার্শনিক বা রাজনৈতিক দর্শনের এই ধারাটি ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ব্যক্তিস্বাধীনতার মন্ত্র ব্যবহার করে স্বাধীনতার দাবিকে যৌক্তিক রূপ দিতে সাহায্য করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা বাংলাকে যা শিখিয়েছে, তা দিয়েই বাংলা ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় দিয়েছে। গণতন্ত্র ও উদারনীতিবাদের সঙ্গে বাংলার পরিচিতি সেই অর্থে নিজের উৎস থেকে আসেনি, এসেছে ঔপনিবেশিক প্রভুদের থেকে, যদিও সেই পরিচিতি খণ্ডিতভাবে হিন্দুসম্প্রদায়কে উপকৃত করেছে সবচেয়ে বেশি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমলে শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে ধারাটি স্থিতি পেল মূলত অর্থনীতির কারণে। সৌদি পেট্রো ডলার এবং ওয়াহাবি আদর্শের অধীন হয়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা, মাদ্রাসাশিক্ষা, নানা জাতীয় সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এক জাতীয় উদারচিন্তা পরিপন্থী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ধারা জন্ম নিল। সেই ধারা আজও বলবৎ আছে। সেটি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তো বটেই, সমাজের আধুনিক বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ভাগ্য ভারতের তুলনায় কেন ভিন্ন হলো, সেটি বুঝতে গেলে ইতিহাসের এ দিকটি কিছুটা হলেও আমাদের সাহায্য করবে। ভারত স্বাধীন হয়েছে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার এক দিন পর। সে বিচারে পাকিস্তান বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু ভারত যেটি অর্জন করছে, সেটি আমরা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছি। গণতন্ত্রের মুখ দেখি দেখি করেও দেখিনি।

তবে উদারনীতির অনুপস্থিতি তার ছাপ রেখে গেছে মূলত দুটি ক্ষেত্রে। একটি ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মীয় গণসংস্কৃতির ক্রমান্বয়িক প্রভাব আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিলাভে। ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাবের প্রসঙ্গ পরে। তার আগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতবিরোধিতা বা হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিস্তৃতি কতটুকু জানি না, কিন্তু বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর

মধ্যে ভারতকে নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই। জনমনে ভারতবিরোধিতা উসকে দেওয়া যেমন একটি ধারা, তেমনি দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ভারতের আনুকূল্য কোন দিকে, তা নিয়ে নানা মাথাব্যথা আছে। একে আমি সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্বের প্রলম্বিত রূপ হিসেবে ভাবি। পাকিস্তানকে আমরা বিদায় দিয়েছি কিন্তু যে মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো তার অধীনে গড়ে উঠেছিল, সেটি বহাল তবিয়তেই আছে।

আমাদের রাজনীতিতে বৈদেশিক প্রভাব নিয়ে কথাবার্তায় নানাভাবে ভারতের ভূমিকাকে মূল টার্গেট করা হয়। আলী রীয়াজের একটি প্রবন্ধ পড়ে সেটিই মনে হয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করছেন, 'ভারতের পক্ষপাত সব সময়ই আওয়ামী লীগের অনুকূলে। একপক্ষীয় নির্বাচনের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমালোচনার বিরুদ্ধে ভারত বাংলাদেশ সরকারের বর্ম হিসেবেই কাজ করছে।' এই বর্ম সাহায্য দেওয়ার চারটি কারণ প্রবন্ধে আছে—১. বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, ২. চীনের প্রভাবকে মোকাবিলা প্রয়োজন, ৩. দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের মিত্রের অভাব, ৪. রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ রক্ষা করা। তবে প্রবন্ধে উদ্বেগটা একমাত্র ভারতকে নিয়ে। অন্য দেশ নিয়ে আলাপের ক্ষেত্রে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৌনতা। কোনো উচ্চবাচ্য নেই আমেরিকা সম্পর্কে। অথচ বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নির্বাচনপূর্ব তৎপরতা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বাড়িতে বাড়িতে তিনি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করে কী করতে হবে; সংলাপের চরিত্র কী হবে, তা নিয়ে নানা উপদেশ।

মার্কিন ভূকৌশলগত রাজনীতি কি আমরা একেবারেই ভুলে গেছি? অতীতকে নাহয় বাদই দিলাম। ইদানীং ভারত মহাসাগর নিয়ে তার মহাপরিকল্পনায় বাংলাদেশ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট, সেটি তারা রেখেঢেকে রাখেনি। পাকিস্তান নিয়েও কোনো কথাবার্তা নেই। অথচ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি'। সেই গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে পাকিস্তানের আইএসআইয়ের মতো ধুরন্ধর আর আমাদের স্বাধীনতা বিপন্নকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নানা পাঁয়তারা সম্পর্কে প্রবন্ধ একেবারে নীরব—মাথাব্যথাটা কেবল ভারতকে নিয়ে। এমনকি চীনও এখানে বাদ। নামটি পর্যন্ত অনুচ্চারিত থেকে গেছে।

বাঙালি ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনটি বাংলাদেশে প্রাধান্য পাবে, সে প্রশ্ন কেবল আদর্শিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাকে ঘিরে উত্তেজনা, সেই সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপুল প্রভাব। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপ ধর্মীয় হবে, নাকি ধর্মনিরপেক্ষ হবে—পাকিস্তানপন্থী হবে, নাকি ভারতপন্থী বা আরবপন্থী হবে, নাকি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র, নাকি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—এসব প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত অথবা মীমাংসিত হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শক্তি অতীতের বিভিন্ন প্রতীক (icons and

symbols), ইতিহাসের অবশিষ্টাংশের ব্যবহার করে তাকে চাঙা রাখছে। ধর্মীয় বিশ্বাস বাংলাদেশে যে অনুভূতির জগৎ গড়ে তুলেছে, তার গভীরে গেলে সংঘাতের ভূগর্ভস্থ একটি স্রোত প্রবাহিত হতে দেখি। স্রোতের একদিকে রয়েছে লোকজ মিশ্র আধ্যাত্মিকতা। সুফিবাদ ও হিন্দু আধ্যাত্মিকতার এক অদ্ভুত মিশ্রণ থেকে জাত ওই চৈতন্য দীর্ঘকাল এখানকার মানুষের আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষুধা মিটিয়ে এসেছে। আর সেটিই পরিণত হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম একটি উৎসে।

তবে আংশিকভাবে ব্রিটিশ আমলে, বাকিটা পাকিস্তান আমলে বেড়ে ওঠা ভিন্ন ধারার এক ইসলাম ওই মিশ্র আধ্যাত্মিকতার বিরোধী। তারই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য-প্রভাবিত মৌলবাদী সালাফি ও ওয়াহাবি ধারা, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি ইসলামের বহুমুখী স্রোত এক হয়ে একটি লোকপ্রিয়, উগ্র, উৎকট এবং পোশাকি ইসলামের জন্ম দিয়েছে। সেই ইসলাম জঙ্গি। আধ্যাত্মিকতার বিশেষ কোন গুরুত্ব এই ইসলামে নেই। তার কাছে রাজনীতিই প্রাধান্য পায়। সেখানে আরও রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতি বর্জনের সূক্ষ্ম প্রবণতা। বাঙালি ইসলামের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই সংঘাতের একটি অন্যতম গ্রন্থি বা কারণ।

স্বাধীন হওয়ার পর জাতিরাষ্ট্রের বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ বাংলাদেশে শক্তিশালী হয়েছে, তার ভিত যদিও প্রবলভাবে শক্ত মাটির ওপর এখনো দাঁড়াতে পারেনি। শক্ত স্তম্ভের মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রধান। জাতি-পরিচয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রধান স্তম্ভ ভাষা। বাঙালি মননে দিনটি দৃঢ়ভাবে স্থায়ী। স্বাধীনতা দিবস জাতীয় ঐক্যের স্তম্ভ। দিনটি জাতীয় জীবনের অনন্য এক ঘটনা। জাতি-ঐক্যের প্রধান উপকরণ। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস আরেকটি আবেগময় দিন। এ ছাড়া আছে রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাইলফলক। আপামর জনগণের কাছে তারা স্বীকৃত।

বাঙালি সংস্কৃতিতে পয়লা বৈশাখ পালিত হয় দেশ-কাল-পাত্রনির্বিশেষে। রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের জীবনে দখল করে আছে বড় স্থান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও স্থান করে নিয়েছে কিছুটা হলেও। সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে জাতি-পরিচয়ের এই সুবিন্যস্ত কাঠামো যেভাবেই হোক বেড়ে উঠছে। তবে এই প্রাপ্তিগুলোকে নস্যাৎ করার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আছে। তারা মূলত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী। তারা বাঙালি জাতি-পরিচয়ের বিরুদ্ধে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বাঙালি জাতি-পরিচয়ের বিপরীত। ধর্মীয় রাজনীতি ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে দেখে। স্বাধীনতাযুদ্ধ তাদের দৃষ্টিতে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ফসল। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার অপরাধকে তরলীকৃত করে মৃতের সংখ্যা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসকে পালনযোগ্য দিন মনে করা হয় না। পয়লা বৈশাখ পালন তাদের কাছে ধর্মবিরোধী। রবীন্দ্রনাথকে নজরুলের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ রচনা করা হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থার বদলে মোল্লাতন্ত্রের শাসন কামনা করে। জাতি-পরিচয়ভিত্তিক যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তার বদলে তারা বাংলাদেশকে দেখতে চায় ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে—বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে অবস্থানের বৈপরীত্য এতই শক্তিশালী যে এই মূল দ্বন্দ্ব দিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়।

তবে পশ্চিমা রাজনৈতিক সাহিত্যে, বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে এই বিভেদকে বিশেষ মূল্য দেওয়ার রেওয়াজ নেই। সেখানে বিভাজনটি 'মৌলবাদী' এবং 'সংস্কারবাদী' ইসলামের মধ্যে। আলী রীয়াজের ওই প্রবন্ধে এই বিভাজনের অলস আভাস আছে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে যে স্থানীয় ও সমন্বয়বাদী (syncretic) ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হতো, তার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিপরীতক্রমে একটি রক্ষণশীল আক্ষরিক (literalist) ব্যাখ্যা এবং একই সঙ্গে একটি বৈশ্বিক ব্যাখ্যার ইসলামের প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান।' পরবর্তী সময়ে প্রবন্ধকার আরও বলছেন, 'এই রাজনীতি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হলেও প্রবণতার দিক থেকে আমরা একে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল এবং সংস্কারপন্থী।' তাঁর মতে, এই সংস্কারপন্থী ধারা গত কয়েক বছরে দুর্বল হয়েছে নানা কারণে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের (আওয়ামী লীগ) সংস্কারপন্থী শক্তিবিরোধী অবস্থান।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সংস্কারবাদীরা কারা, তার কোনো উল্লেখ নেই। তবে ধারণা করি, এই তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে মার্কিন সরকারের অনুসৃত নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিন কূটনৈতিক উৎপাতের সময় দাবি করা হয়েছিল, বিদ্রোহী ইসলামিদের মধ্যে একটি বড় অংশ আছে, যারা সংস্কারপন্থী এবং আল-কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটের মতো উগ্রবাদী নয়। সেই ধারণা থেকে তাদের হাতে অত্যাধুনিক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হলো। আশা, আসাদ সরকারকে উৎখাত করার পর এই সংস্কারবাদীরা ক্ষমতা গ্রহণ করবে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সরকার ওই সংস্কারবাদীদের সংখ্যাগত শক্তিকে উল্লেখ করল ৫০ হাজার বলে। কিন্তু ফলাফল? তথাকথিত সংস্কারবাদীরা অস্ত্র পেয়ে প্রথমে দু-একবার বন্দুক ফোটাল। বোমা মারল, কামান দাগল। তারপর যা হওয়ার তা-ই হলো। স্বেচ্ছায় এই 'সংস্কারপন্থীরা' মার্কিন অস্ত্রগুলো পৌঁছে দিল ইসলামিক স্টেট আর আল-কায়েদার হাতে। তথাকথিত সংস্কারবাদীদের নিয়ে সেই মার্কিন উৎসাহ আজও যে টিমটিম করে প্রজ্জ্বলিত থাকবে, ভাবিনি।

কিন্তু সেই ধর্মের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। বাঙালি সংস্কৃতিতে দ্বন্দ্বটি রক্ষণশীল আর সংস্কারবাদীদের মধ্যে নয়। দ্বন্দ্বটি মূলত আদি ইসলামের সঙ্গে রাজনৈতিক, মৌলবাদী ও লোকপ্রিয় ইসলামের। ওই দ্বন্দ্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে ধর্মবিশ্বাসের

অভ্যন্তরীণ ব্যাপার থাকেনি। ধর্মের সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। বাস্তব জীবন ও আধ্যাত্মিকতার এই ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আদি ইসলাম ধর্মকে সংকীর্ণ মৌলবাদী চিন্তা থেকে দূরে রেখেছিল। অনেক বেশি আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমূলক হওয়ার কারণে হিন্দু ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল। দুয়ে মিলে একে অপরকে প্রভাবিত করে তাদের প্রসার ঘটেছে।

বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট হিন্দু বাউলদের সঙ্গে সুফিবাদের যথেষ্ট মিল থাকায় তাদের মধ্যে এক অভিন্ন বিশ্বাসের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। বেশ কয়েকটি শ্রামানিক (Shramanic tradition) ধারাও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদের মধ্যে উত্তর ভারতে কবির (১৪৪০-১৫১৮); বাংলায় শ্রীচৈতন্য (১৪৪৬-১৫৩৩) বা গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৯) চিন্তাজগতের প্রভাব উল্লেখ করা যায়। এসব প্রভাব মিলিয়ে সুফিবাদ এক বিশেষ আধ্যাত্মিক জগৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়, যেখানে বিশেষ করে কবিরের ভূমিকাকে অস্বীকার করা কঠিন। এভাবে সুফিসাধকের ইসলাম ও হিন্দুধর্মের লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে একজাতীয় সমন্বয় গড়ে ওঠে, যা থেকে জন্ম নেয় এক বিশেষ বাঙালি ইসলামের। সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের আনুষ্ঠানিকতার বদলে লৌকিক ধর্মের প্রাধান্য লক্ষণীয়, আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জীবনের বস্তুগত চাহিদা পূরণের সংগ্রাম দখল করে নিয়েছিল বিশেষ স্থান। এই বিশেষ ইসলামকে 'মার্কিন সংস্কারবাদ' বলে ভুল করা যাবে না। কারণ, এটির উদ্দেশ্য ধর্মের সংস্কার নয়, বরং স্থানীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠা একটি স্বাজাতিক ধারা। এ বস্তুতান্ত্রিক এবং জীবনমুখী, ধর্মের সঙ্গে কর্মের অপূর্ব মিলন। সেটি বুঝতে রিচার্ড ইটনের লেখাটি ঝালিয়ে নিতে দোষ নেই।

তবে এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যন্তরে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। কীভাবে এই নতুন শক্তির উদয় হলো, সেটি বুঝতে হলে সত্তর দশকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ধর্মের প্রতি আমাদের আচরণে পরিবর্তনটি লক্ষ করতে হবে। পরিবর্তনটি এল বিশ্বায়নের কারণে। বিশ্বায়নের কারণে আন্তদেশীয় যোগাযোগ বাড়ল। মানুষ দেশত্যাগী হলো। স্বদেশ ছেড়ে জনপ্রবাহ স্থিত হলো মধ্যপ্রাচ্য বা আরও কোনো দেশে। ধর্মের বাহ্যিক দিকের প্রতি আনুগত্য, পোশাক-আশাকে, ধর্মীয় কর্তব্য পালন তাদের ধর্মাচার, জীবনপ্রথা, জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি আর ধর্মীয় সচেতনতা সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। পাশাপাশি সৌদি আরব বা গালফ দেশগুলোর অর্থসহায়তায় গড়ে উঠল মাদ্রাসাশিক্ষার বিশাল নেটওয়ার্ক। এই প্রবাহের অন্তরালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অঙ্কুরিত উপস্থিতি গত চার দশক ধরে ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ থেকে। ন্যূনতম খাওয়া-পরার চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি অর্থ তাঁরা স্বদেশে পাঠান। সেই চুইয়ে পড়া ঐশ্বর্যের

কল্যাণে গ্রামের ঘরে ঘরে স্বচ্ছন্দ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। জন্ম নিয়েছে নতুন মধ্যবিত্তের। যে কাজটি এখনো বাকি, সেটি হচ্ছে বৃহত্তর সমাজে তার স্বীকৃতি। সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতির বাসনা (রাজনৈতিক ও সামাজিক) তার অন্তরে যে নেই তা নয়। আজ তারাই মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় বাহিনী।

গুণগতভাবে এরা পূর্বের, অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত থেকে ভিন্ন। এদের আদর্শগত অবস্থান, অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য প্রবল। এর অগ্রবাহিনী হিসেবে রয়েছে মাদ্রাসাশিক্ষক এবং ছাত্রদের সুশৃঙ্খল বাহিনী। তাদের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের ব্লগারদের শায়েস্তা করা, নারীদের 'অশালীনতার' বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। আরও দাবির মধ্যে শাসনতন্ত্রে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা-ঘোষণাটি লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যেকোনো উক্তির শাস্তি হতে হবে মৃত্যুদণ্ড। নাস্তিক ও ব্লগারদের বিরুদ্ধে নিতে হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা। বন্ধ করতে হবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। স্কুলে ইসলামিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আহমদিয়াদের অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। মিডিয়ায় ইসলামপরিপন্থী খবর ছাপা নিষিদ্ধ করতে হবে। সব মিলিয়ে দাবির সংখ্যা মোট ১৩টি। দাবিগুলো সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হোক, সেটি তারা চায়। তবে তাদের প্রতিবাদ কেবল দাবিগুলোর মধ্যে সীমিত নেই। তারা চায় ইসলামপন্থী সরকার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হোক। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ধারণায় নাস্তিক ও নাস্তিকতাকে উৎসাহিত করে। সে কারণে ওই সরকারের উৎখাতও তাদের কাম্য।

এই প্রেক্ষাপটে উদারনীতির বিশেষ ভূমিকাকে কেবল গণতন্ত্রের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে যাচাই করা উচিত হবে না। গণতন্ত্রের ব্যাপ্তি আরও ব্যাপক, তাকে দেখতে হবে আরও সম্প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে—অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকারসহ আধুনিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মেধার বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নাগরিক অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটিকে কেবল অর্থনীতি বা রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দেখা বোকামি। জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে সর্বসাধারণের অন্তর্ভুক্তির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন, সংস্কৃতি—এসব অঙ্গনে আপামর মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ না হলে সমাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। সেই অন্তর্ভুক্তি গড়ে উঠতে পারে কেবল প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক পরিবেশে।

তিন

বিশ্বায়নের যুগটাই আলাদা। জানা-অজানা নানা তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে শাসনের ক্ষেত্রে ভিনদেশের নানা বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতা চোখে

পড়ছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে একটি ধারা পরিষ্কার হচ্ছে, তা হলো গণতন্ত্র মানেই সবচেয়ে ভালো শাসনব্যবস্থা নয়। ব্রিটিশ ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের গণতন্ত্র নিয়ে আমরা বড়াই করি। কিন্তু তার সামনে আজ শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ মূলত দুটি কারণে। এক. প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের প্রবল অনীহা। দুই. গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা বলতে যেসব একদলীয় শাসন বা স্বৈরাচার শাসনকে বুঝি, তাকে গণতন্ত্রের চেয়ে নিকৃষ্ট ভাবা যুক্তিসংগত কি না, প্রশ্নটি ইদানীং বেশ ফ্যাশনদুরস্ত হয়ে উঠেছে। অনেকেরই জিজ্ঞাস্য, যদি নিকৃষ্টই হবে তাহলে যেসব দেশে গণতন্ত্রের অভাব রয়েছে বলে বিশ্বদরবারে পরিত্যাজ্য বা একঘরে করে রাখা হয়েছিল (চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া), সেসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর চেয়ে কেন এগিয়ে আছে?

ব্রিটিশ ওয়েস্টমিনস্টার টাইপের গণতন্ত্রের প্রতি মানুষ সত্যিই বীতশ্রদ্ধ। সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক গণতন্ত্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন জনগণের স্বার্থকে কতটুকু রক্ষা করে বা আদৌ করে কি না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। অতীতের কিছু উদাহরণ আছে। হিটলারের নাৎসি পার্টি বা ইরানের আয়াতুল্লার শাসন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে ক্ষমতায় এসেছিল। জনগণ-প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে হিটলার পৃথিবীকে কোথায় নিয়েছিলেন, সেটি অজানা নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে জনসংখ্যার ৫১ শতাংশকে বোঝালেও ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বাকি ৪৯ শতাংশকে বঞ্চিত করার অধিকার পায়। বাংলাদেশে প্রায় সব নির্বাচনে বিজয়ী দল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অত্যাচার, নিপীড়ন, রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের কৌশল বেছে নেয়। এর উদাহরণ একাধিক। এ ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন জাতিগতভাবে বিভক্ত সমাজে অহরহ ঘটছে। ইরাকে শিয়া বা সুন্নি সম্প্রদায় সংখ্যাগত দিক দিয়ে প্রায় সমান। সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র শিয়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিজয় এনে দিলেও জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ হয়েও সুন্নিরা ক্ষমতাকাঠামো এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। ওই একই প্রশ্ন কানাডার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি। সেখানে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাভাষী মানুষের প্রায় সমান উপস্থিতি সত্ত্বেও শক্তিশালী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। জাতিগতভাবে বিভক্ত সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযোগী কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে ঘিরে দ্বিতীয় সংশয় হচ্ছে, অল্প ভোটের ব্যবধানে যাঁরা জনগণের প্রতিনিধি হন, আর যাঁরা অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে যান, তাঁদের মধ্যে অবস্থানগত পার্থক্য নগণ্য হতে পারে। জনগণ কেন একজনকে নির্বাচিত করে বা অন্যকে করে না, তার কারণ এই নয় যে যিনি নির্বাচিত হলেন, তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, দূরদর্শী বা দক্ষ। নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠি জ্ঞান নয়, দক্ষতা নয়,

এমনকি প্রার্থীর দূরদর্শিতাও নয়। আরও বহুবিধ কারণ সেখানে থাকতে পারে। মিথ্যা প্রলোভন, অর্থ, সস্তা প্রতিশ্রুতি, জনবন্ধুর মুখোশ পরে মানুষকে পক্ষে টানা সম্ভব হলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় তার প্রভাব পড়ে (ম্যাকিয়াভেলি ওভাবে শাসন করার উপদেশ দিয়ে গেছেন)। সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে কারণে ভয়ংকর, যদি নিম্নমানের বুদ্ধিবৃত্তিকতাকে গণতন্ত্রে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বুদ্ধি নয়, সংখ্যা প্রাধান্য পেলে গণতন্ত্র নিম্নমানের হবেই। অভিযোগটি একেবারে মিথ্যা ভাবা কঠিন। গ্রিক নগররাষ্ট্রে সক্রেটিসকে হেনস্তা হতে হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠেরই হাতে। যদিও তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। এ সমস্যাগুলো পশ্চিমা বিশ্বে সমাজ পরিচালনার মূল তত্ত্ব উদারনীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের সার্বভৌমত্ব রক্ষা (সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন) করে। কিন্তু একই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেন ওই শাসন সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারকে খর্ব না করে (Plattner 2010, p. 84)। এটি পশ্চিমা দেশগুলোতে বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিষয়টিকে নিঃসন্দেহে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের আরও সমস্যা হচ্ছে লোকপ্রিয় (populist) রাজনীতি। লোকপ্রিয় স্লোগান ব্যবহার করে জনগণের সমর্থন আদায় করা সম্ভব। লোকপ্রিয় রাজনীতির প্রতি জনগণ সহজে আকৃষ্ট হয়। ওই রাজনীতি তাদের ভাগ্যে পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। ক্ষমতায় যাওয়ার পর ওই লোকপ্রিয় নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এ থেকে সমাজে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। বস্তুত এর অনেক উদাহরণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকালে শেখ মুজিবুর রহমান যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর সেগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে যেতে হয়েছে নানা ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে। লোকপ্রিয় রাজনীতি তার উদ্দেশ্য সফল করতে যেকোনো আদর্শ ব্যবহার করে। ফ্রান্সে লো পেন সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমবিরোধী স্লোগান ব্যবহার করে প্রচুর ভোট পেয়েছে। অস্ট্রিয়ায় জোরগ্ হেয়ডার অথবা ভেনেজুয়েলায় হুগো চাভেজের লোকপ্রিয় রাজনীতিও এখানে উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিজেপি পার্টি ধর্মীয় বিভেদ এবং হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি তুলে ধর্মকে ব্যবহার করে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে বিজয়ী হয়। এ ধরনের লোকপ্রিয় রাজনীতির চর্চা আমরা বাংলাদেশেও লক্ষ করছি। ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে হেফাজতে ইসলাম বা আরও অনেক ধর্মীয় রাজনৈতিক দল জনগণকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তারাই অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে জনগণের ভূমিকাটি আজও প্রশ্নবোধক হয়ে আছে।

গণতন্ত্রকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে ধরা হলেও মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখছে এমনকি সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র দিয়ে কাজ হচ্ছে না। গণতন্ত্রের দুর্বল দিকগুলো আজ যথেষ্ট সুস্পষ্ট। জনগণ সার্বিকভাবে রাজনীতিবিদদের প্রতি সন্দিহান। তাদের ঘিরে নানা ধরনের দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির অভিযোগ আছে। নিয়মিত নির্বাচন হলেও ক্ষমতা গ্রহণের পর নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক নিয়মে দেশ চালায় না। গণতন্ত্রের নাম ব্যবহার করে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়। আইনের শাসনে বাধা পড়ে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান নেই—হলেও অনেক বিলম্বে। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে এসব দুর্বলতার কারণে আমলাতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমার্জনীয় অদক্ষতা, তোষামোদি আর দুর্নীতি। দুর্নীতিগ্রস্ত, আত্মকেন্দ্রিক। স্বজনপ্রীতিদুষ্ট এই গণতন্ত্রকে অনেকেই dominant power politics হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সে কারণে গণতন্ত্র একধরনের স্থবিরতায় আটকে আছে (stagnation of freedom)। তার মন্দাভাব (democratic recession) একেবারে সর্বজনবিদিত। গুণগত মানের বিচারে গণতন্ত্র আজ সংকটে। সেই সংকট বিশ্বব্যাপী।

তবে পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রতি বড় চ্যালেঞ্জ অবশ্য অন্যখান থেকে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝার উপায় নেই যে গণতন্ত্রের সত্যিকার প্রায়োগিক মূল্য পরিমাপে কেবল নির্বাচন, তার সঠিক প্রক্রিয়া, গণমানুষের অংশগ্রহণ, বাক্‌স্বাধীনতা বোঝালেও তাকে যাচাই করা উচিত দুটি মানদণ্ডের সমন্বয়ে। একটিকে vertical accountability বলা হয়। অন্যটি horizontal accountability হিসেবে পরিচিত। প্রথমটির সঙ্গে গণমানুষের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন কতটুকু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলো, কতটুকু কার্যকরী বা সমস্যামুক্ত থাকল—তার ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রকে বিচার করা যায়। অর্থাৎ সময়মতো নির্বাচন হচ্ছে কি না, সব মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত হলো কি না, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ কি না, মানুষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কি না, মানুষ বিনা দ্বিধায় সংগঠিত হতে পারে কি না, ইচ্ছা অনুযায়ী রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিতে পারে কি না, রাজনৈতিক দল তাদের ম্যানিফেস্টো প্রচারে বাধার সম্মুখীন হয় কি না, বিচার বিভাগ স্বাধীন কি না ইত্যাদি দিক ধরে গণতন্ত্রের সাবলীলতাকে যাচাই করা সম্ভব। অন্য মানদণ্ডকে horizontal accountability বলা হয়। এখানে নির্বাচিত সরকার বা জনপ্রতিনিধিরা ক্ষমতা গ্রহণের পর তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি না, সেটি প্রধান। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো একই সমতলে অবস্থান করে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক উঁচু-নিচু ভেদ না থাকায় তাকে সমান্তরাল

(horizontal) ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়। ক্ষমতা গ্রহণের পর গণপ্রতিনিধিরা কীভাবে দেশ পরিচালনা করেন, গণতান্ত্রিক নিয়ম মেনে চলেন কি না, প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ স্বাধীনতা ভোগ করে কি না, সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণ যথাযথ এবং দলমত-নির্বিশেষে উপযুক্ত সেবা পেয়ে থাকে কি না, ন্যায়বিচার পাওয়ার সব পথ উন্মুক্ত থাকে কি না, সামাজিক সমতার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় কি না, জাতিগতভাবে সমাজের সংখ্যালঘু অংশ বা অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্র মনোযোগী কি না ইত্যাদি প্রশ্ন এর আওতায় পড়ছে।

তবে এই দুই মানদণ্ডকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সমীচীন নয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক। গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে যাচাই করতে গেলে উভয় মানদণ্ডের যুগপৎ প্রয়োগ এবং উভয়ের ওপর সমান জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের প্রায় সব দেশে এই দুইয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নানা দেশ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াকে ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক বা ভূকৌশলগত কারণে গণতন্ত্রকে বিচার করতে গিয়ে এই দুইয়ের ওপর সমান মনোযোগ দেওয়া হয় না। এটি চীনের উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। চীনে নিরপেক্ষ ও প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন হয় কি না, সে নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। একটিমাত্র রাজনৈতিক দল সরকারিভাবে সেখানে স্বীকৃত এবং ওই দলের মনোনীত প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নেয় এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এভাবে গড়ে ওঠা পার্লামেন্টকে পশ্চিমা গণমাধ্যম জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। একদলীয় শাসন গণতন্ত্রের মাপে পড়ে না। পশ্চিমা বিশ্বের মতো বহুদলীয় গণতন্ত্র নেই, দলীয় প্রতিযোগিতা নেই এবং জনগণ পুরোমাত্রায় বাক্‌স্বাধীনতা ভোগ করে না। স্বাধীনভাবে জোট গঠন এবং চলাফেরা করার ক্ষেত্রেও নানা রকমের বিধিনিষেধ আছে। অর্থাৎ vertical accountability প্রশ্নে চীন সব শর্ত পূরণ করে না।

কিন্তু চীনে গণমানুষের সেবায় নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ইউরোপীয় উন্নত দেশের মতোই ভালো কাজ করে। মাত্র ৬৫ বছরের ব্যবধানে ১০০ কোটির বেশি মানুষকে চীনের একদলীয় সরকার অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। অর্থাৎ horizontal accountability প্রশ্নে চীনের অর্জন অতুলনীয়। তাহলে চীনকে কীভাবে বিচার করব? যদি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দিক থেকে ভাবি, তাহলে গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা বা জনগণের মঙ্গলভাবনার দিক থেকে বিচার করলে চীন নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক দেশের আওতায় পড়ে। গণতন্ত্রকে বিচার করার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে ডিলেমা। বাংলাদেশও

এই ডিলেমার মধ্যে পড়ে। এখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে কিন্তু নির্বাচন নিরপেক্ষ হচ্ছে না। একই সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে দেশটি আপেক্ষিক অর্থে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো এবং গণতন্ত্রের যাত্রা শেষ হলো, সে ধরনের চিন্তাকে নিতান্তই সরলীকৃত ভাবতে হবে। অনির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে রাষ্ট্রের শাসন কার্যক্রম পরিচালনাকে গণতন্ত্র হিসেবে ধরা যায় না। গণতন্ত্রকে নিঃসন্দেহে বিচার করতে হবে ওই দুই মাপকাঠির সমন্বয়ে, কেবল ওই দুইয়ের একটির ওপর জোর দিয়ে নয়। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, মানুষ গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত সঠিকতা নিয়ে যতটুকু উৎসাহী, জনকল্যাণ নিয়ে ততটুকু নয়।

পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রের প্রতি অনীহা ক্রমাগত বৃদ্ধির আরেক উদাহরণ পূর্ব এশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ পশ্চিমা বিশ্বের দেওয়া গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করে। তার বদলে বিশেষ একধরনের গণতন্ত্র তাদের কাম্য। সেই ধরনটি লক্ষ করি জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরে। পশ্চিমা লিবারেল আদর্শের পরিবর্তে ওই গণতন্ত্র এশীয় মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাকেই তারা এশীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের সঠিক মডেল হিসেবে বিবেচনা করে। এশীয় মূল্যবোধের প্রধান তাত্ত্বিক উৎস চীনা পণ্ডিত কনফুসিয়াসের দর্শন। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের দুই নেতা (যথাক্রমে মাহাথির মোহাম্মদ এবং লি কোয়ান ইউ) এশীয় মূল্যবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। আধুনিক সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা এবং ওই দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের নায়ক লি কোয়ান ইউ এশীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ এবং শাসনকৌশলের মডেলকে এশীয় সমাজে প্রযোজ্য মনে করেননি। সমাজে কনফুসীয় দর্শনের পাঁচটি নীতি, যেগুলো বলতে বুঝি পিতা ও পুত্রের মধ্যে ভালোবাসা এবং স্নেহ, শাসক ও জনগণের দায়িত্ব; স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য; স্বল্প বয়সীদের তুলনায় বয়স্ক মানুষের বুদ্ধিমত্তার ওপর আস্থা এবং বন্ধুদের মধ্যে আস্থা বা বিশ্বাস (Nathan, A 2012, p. 2) সমাজে বাস্তবায়ন করে সেসব দেশে লিবারেল গণতন্ত্রের বিকল্প এক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এশীয় মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শাসনপদ্ধতি গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের সূক্ষ্ম মিশ্রণ। কিন্তু সেখানে শৃঙ্খলা, গুরুজনের প্রতি সম্মান, পিতা-মাতার মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা, যেগুলোর ঘাটতি পশ্চিমা লিবারেল সমাজে লক্ষ করি। এ ধরনের এশীয় গণতন্ত্র নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেন কিন্তু সুশাসন ও স্থায়িত্বের দিক থেকে বিচার করলে এ গণতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত।

গণতন্ত্রের সামনে আরও বড় ধরনের এক চ্যালেঞ্জ ইদানীং যুক্ত হয়েছে। তার সঙ্গে উদারনৈতিক গণতন্ত্রবিরোধী দুটি জনপ্রিয় ধারা যুক্ত। ওই দুই ধারা পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিরোধিতা করে। ভেনেজুয়েলার এককালের প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজ ও তাঁর বিপ্লবী রাজনীতি এর একটি উদাহরণ। হুগো চাভেজের গণতন্ত্র অনেকটা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (direct democracy) মতো (Krastev Ivan, 2006, p.52)। সমাজকে তিনি দুই মেরুতে ভাগ করে নিপীড়িত এবং দরিদ্র জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ধনিকগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল যেসব রাজনৈতিক দল, তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এভাবে জনপ্রিয়তার বিশেষ ভিত গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তবে দেশের সম্পদকে গরিব জনগণের মধ্যে ইচ্ছেমতো বিতরণ করে ওই লোকপ্রিয় রাজনীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে সমর্থনকে আরও জোরদার করলেও অর্থনীতি সার্বিক বিচারে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। সেই সঙ্গে মার্কিনবিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে গণতন্ত্রের একটি বিশেষ কাঠামো গড়ে উঠলেও তাকে tyrany of the majority বলাই শ্রেয় (Krastev Ivan 2006, p. 54)।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের শাসনও লোকপ্রিয় রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাকে একধরনের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবেও ভাবা যায়। স্বল্পসংখ্যক এলিট শ্রেণির শক্তিশালী সমর্থন নিয়ে ওই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তবে তার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে কিন্তু ঘাটতি নেই। ক্ষুদ্র এলিট শ্রেণি ওই গণতন্ত্রের প্রধান শক্তি। তারা নির্বাচন করে। মিডিয়ার স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু নির্বাচন হয় নিয়ন্ত্রিত, ফলে ক্ষমতায় কোনো রদবদল হয় না, বিদ্যমান ক্ষমতাকে ন্যায়সংগত করে। ইউরোপ ও মার্কিনবিরোধী স্লোগান ব্যবহার করে এই গণতন্ত্রে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সূক্ষ্ম কৌশল আছে। এই দুই ধরনের শাসনব্যবস্থা (ভেনেজুয়েলা ও রাশিয়া) পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রের প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সে কারণে রাশিয়ার মতো আরও যেসব দেশে ওই জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোকে স্বৈরতন্ত্র প্রসারের পক্ষশক্তি (autocracy promoter or democracy resister) হিসেবে দেখা হলেও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চেয়ে এরা অনেক বেশি কার্যকর। ফলে গণতন্ত্রের ইউরোপীয় মডেল একমাত্র সঠিক মডেল নয়। কারণ, সভ্যতা নানা দেশে নানাভাবে বিকশিত হয়।

অনেকের কাছে উদারনৈতিক গণতন্ত্র উপযোগী নয় কেন, তার পেছনে একটি বড় যুক্তি হচ্ছে তার অনুসৃত অর্থনীতি। ২০০৮-০৯ সালে বিশ্বব্যাপী উদারনৈতিক অর্থনীতির যে সংকট দেখা দেয়, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা ও সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে পড়ে। সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা নেমে আসে। বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়। গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন,

আয়ারল্যান্ডসহ আরও অনেক ইউরোপীয় দেশ গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। এ থেকে উদারনীতির প্রতি এবং বিশেষভাবে উদারনৈতিক অর্থনীতির প্রতি বিক্ষোভ ও অসন্তোষ রয়ে গেছে। এ সমস্যা থেকে বলতে গেলে চীনই একমাত্র মুক্ত ছিল। সেখানে উদারনৈতিক অর্থনীতির পরিবর্তে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি বলবৎ রয়েছে। ফলে সারা বিশ্বে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি একধরনের মৌন সমর্থন গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

গণতন্ত্রের অধীনে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব বলে যে তত্ত্বের সঙ্গে এত দিন ধরে আমরা পরিচিত ছিলাম (Siegle and et.al, 2004, p. 58) এবং যার কারণে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের সমর্থন ছিল, সেই তত্ত্ব অনেকে আজ অকার্যকর ভাবতে শুরু করছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রে দলীয় কোন্দল প্রাধান্য পায় এবং বহু সময় ব্যয় হয় অযথা। দেশের যেসব সমস্যাগুলো মৌলিক, তাদের সমাধান আশু হলেও ওই কোন্দলের কারণে বিলম্ব ঘটে, যেটি গণতন্ত্রের জন্য ভালো কোনো দৃষ্টান্ত নয়। সে তুলনায় চীনে একদলীয় শাসন বলবৎ থাকলেও ওই অগণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন থেমে নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজন সেখানে অনুভূত হচ্ছে না। বস্তুত ওই নিয়মের নানা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এশিয়া মহাদেশীয় একদলীয় গণতন্ত্র দিব্যি বহাল রয়েছে।

এশিয়া মহাদেশে গণতন্ত্র ও অর্থনীতির আন্তসম্পর্ক বেশ অদ্ভুত হলেও তার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। এখানে শিল্পবিপ্লব ছাড়াই গণতন্ত্র কীভাবে এল, সেটিও রহস্য হতে পারে। কিন্তু যে সিদ্ধান্তটি এখানে গুরুত্বের তা হচ্ছে, সেখানে আধুনিকায়ন বা শিল্পায়ন বা নগরায়ণের ওপর অথবা তার অভাবের ওপর গণতন্ত্র নির্ভর করেনি। ভেবে দেখা প্রয়োজন আর্থসামাজিক ফ্যাক্টরের বাইরে অন্যান্য আরও কোনো ফ্যাক্টর সেখানে ক্রিয়াশীল কি না, যেগুলো গণতন্ত্রসংক্রান্ত চিন্তায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। সেই সঙ্গে আর্থসামাজিক পূর্বশর্তসংক্রান্ত পূর্বের তত্ত্বটি গণতন্ত্রের বিচারে কতটুকু গুরুত্ব রাখে, তারও পুনর্মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

যা-ই হোক, Steven Levitsky & Lukan তাঁদের 'The Rise of Competitive Authoritarianism' নামের প্রবন্ধে গণতন্ত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সব দেশকে দুই গ্রুপে ভাগ করেছেন। সেই দুইয়ের একটিকে তাঁরা competitive authoritarianism বা প্রতিযোগিতামূলক স্বৈরতন্ত্র বলেছেন। অন্যটি তাঁদের মতে delegative democracy বা প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। এই দুইয়ের মধ্যে যা অভিন্ন, তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক উপাদানের সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী উপাদানের মিশ্রণ। তাদের ভিন্নতা হচ্ছে, কিছু দেশ এর আওতায় হয় স্বৈরতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে নতুবা গণতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে। যেসব দেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা কম, তারা competitive authoritarianism-এর গ্রুপে

অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে আফ্রিকায় ঘানা, কেনিয়া, মোজাম্বিক, জাম্বিয়া; ইউরোপে রাশিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ইউক্রেন এবং এশিয়ায় মালয়েশিয়া, তাইওয়ান এবং লাতিন আমেরিকায় হাইতি, মেক্সিকো, পেরু ও প্যারাগুয়ে। গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান নিলেও তাদের গতিমুখ মূলত স্বৈরতন্ত্রের দিকে। গণতন্ত্রের প্রতি সেখানে স্থানীয় বিরোধিতা অত্যন্ত প্রবল। কারণ, ওই সব দেশের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, ব্যক্তিচরিত্র, রাজনীতি ও অর্থনীতি স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা দিয়ে প্রভাবিত (Ghia Nodia, 2014: 144)। স্বৈরতন্ত্র সেখানে সম্পৃক্ত সমাজকাঠামোর সঙ্গে। সেই বাধাকে অতিক্রম করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহজ নয়।

অন্যদিকে delegative democracy-তে প্রবণতাটি হচ্ছে গণতন্ত্রের দিকে। যেসব দেশ এই মডেলের আওতায়, তারা গণতন্ত্রের ন্যূনতম নিয়মাবলি মেনে চলে। সরকারের দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিও স্বল্পমাত্রিক। শক্তিশালী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসার দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেও মানুষের মনে কিছু আশার সৃষ্টি হয়। তবে পেশাভিত্তিক শব্দ ব্যবহার করে তাকে systemic optimism বলা হলেও অনেকে systemic pessimism (Aguera Felipe 1998, p. 3) নাম দিয়ে তাদের হতাশা প্রকাশ করে। তার অর্থ হচ্ছে, উত্তরকালীন গণতন্ত্রে উভয় প্রবণতাই রয়ে গেছে। সে কারণে উত্তরণকে একেবারে আশাহীন বলা যায় না। আবার খুব যে আশাপূর্ণ, তা-ও দাবি করা কঠিন। তবে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের দিন শেষ। এই দুইয়ের মিশ্রণই আজকের দিনের সহজ বাস্তবতা।

শেষ কথা

গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদানগুলো বাংলাদেশে যে তার শিকড় একেবারেই বিস্তার করেনি তা নয়। আজ বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ তথ্যের সুযোগ সৃষ্টি রয়েছে। ধর্মীয় তথ্যেরও অভাব নেই। পত্রপত্রিকার সংখ্যা অগণিত, দুটি বিশেষ ভাষায় এখানে খবরের কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে। রাজনৈতিক খবর ছাপার ওপর তেমন নিষেধ নেই। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও ছাপা হয়, যদিও শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা থেকেই যায়। সাংবাদিকেরা লাঞ্ছনার শিকার হন। অনেক সাংবাদিক সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে লাঞ্ছিত বা নিহত হয়েছেন।

তবে প্রতিটি গ্রামে সংবাদপত্র না পৌঁছালেও টেলিভিশনে খবর শোনার সুযোগ প্রায় সবার জন্য খোলা। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য চায়ের ও মুদির দোকান রয়েছে। সেখানে একটি করে টেলিভিশন সেট আছে। শাসনতন্ত্রেও সম-অধিকারের অঙ্গীকার আছে। জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের নিরাপত্তার অঙ্গীকার, যেকোনো সংগঠনে যোগ দেওয়ার নাগরিক অধিকার প্রয়োগে বাধা নেই। মিটিং-মিছিলে অংশ নেওয়ার অধিকার আছে। যদিও সে অধিকার সময়ে সময়ে নানা অজুহাতে

লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিরোধী দলের ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে দেখি কিন্তু বিরোধী দলও যে খুব দায়িত্বশীল, তা-ও নয়। রাজনৈতিক প্রতিবাদ অনেক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ না হয়ে সংঘাত বা সন্ত্রাসে রূপ নেয়। তারাও অন্যের মতামতের প্রতি খুব যে শ্রদ্ধাশীল, তা-ও নয়। সংস্কৃতিচর্চা বা ধর্ম পালনে কোনো বাধানিষেধ নেই। যদিও সংখ্যালঘুদের জীবনে নিরাপত্তার অভাব আছে। সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ বা পাহাড়ি উপজাতিরা নিজের দেশে নিরাপদ বোধ করে না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তাও নিশ্ছিদ্র নয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্র বলতে মিশ্র গণতন্ত্রকেই বুঝব। আমাদের দেশে ওয়েস্টমিনস্টারের সম্ভাবনা খুবই সামান্য, অন্তত অদূর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে।

তবে শেষ করার আগে একটি কথা। তা হলো বিশ্লেষণের নিরপেক্ষতা। সেটিও গণতন্ত্রের জন্য বড় কথা। জাফর সোবহানের উদ্ধৃতি টেনে আলী রীয়াজ ২০১৪ সালের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আগামী বছরে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা খুব সোজাসাপ্টা: চেপে ধরে বিএনপির প্রাণবায়ু বের করে ফেলা অব্যাহত রাখা (সোবহান ২০১৫)।' প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপিকে এই ধারণায় নিরীহ ভুক্তভোগী মনে করা হলেও অতীতে বিএনপি আওয়ামী লীগের প্রাণবায়ু বের করার যেসব প্রচেষ্টা নিয়েছে, তার কিছু প্রতিফলন প্রবন্ধে থাকাটা জরুরি ছিল। সব বাদ দিলেও গ্রেনেড হামলার ব্যাপারটায় আমাদের বোধোদয় হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে প্রাণবায়ু কোনো অতীন্দ্রিয় বিমূর্ত বা প্রতীকী শব্দ ছিল না, একেবারে প্রাণ বের করে দেওয়া, আক্ষরিক অর্থে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করা, সশরীরে—তা-ও রাষ্ট্রের কলকবজা ব্যবহার করে। এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্যহীনতাকে নিরপেক্ষ বুদ্ধিচর্চা বলা কঠিন।

গ্রন্থপঞ্জি

Aguero, Felipe and Jeffrey Stark. ed.. *Fault Line of Democracy in Post-Transition Latin America*. North-South Centre Press, University of Miami, 1998.

Carothers, Thomas. 'The End of the Transition Paradigm.' *Journal of Democracy*, January 2002.

Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. The Johns Hopkins University Press, 1999.

Karl, Terry Lynn. 'Dilemmas of Democratization in Latin America.' *Comparative Politics*, Vol. 23, No. 1 (Oct., 1990).

Krastev, Ivan. 'Democracy's Doubles.' *Journal of Democracy* 17.2 (2006): 52-62.

Levitsky, Steven & Way, A. Lukan. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press. 2010.

Nathan, Andrew. 2012 'Confucius and the Ballot Box: Why Asian Values Do Not Stymie Democracy.' (Book review) *Foreign Affairs*, Number 4, 2012.

Nodia, Ghia. 'External Influence and Democratization: The Revenge of Geopolitics.' *Journal of Democracy* 25.4 (2014): 139-150.

Plattner, Marc F. 'Populism, pluralism, and liberal democracy.' *Journal of Democracy* 21.1 (2010): 81-92.

Siegle, Joseph T. Michael M. Weinstein and Morton H. Halperin. 'Why Democracy Excel.' *Foreign Affairs*, September/October, (2004): 57-71.

আলী রীয়াজ, 'বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি,' সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ, ঢাকা।

গণতন্ত্রের বৈশ্বিক সংকট : পটভূমি, প্রকৃতি ও পথরেখা

আলী রীয়াজ

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীজুড়েই এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে গণতন্ত্রের সংকট। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্য এবং সাধারণ পর্যবেক্ষণেই দেখা যায় যে গত এক দশকে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা কমেছে। ১৯৭৪ সালে শুরু হওয়া গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউয়ের ফলে নতুন যে দেশগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল, তার অনেকগুলোতেই এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাকে বলা হয় 'হাইব্রিড রেজিম'—দৃশ্যত গণতান্ত্রিক কিন্তু সারবস্তু বিবেচনায় স্বৈরতান্ত্রিক। এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত গণতন্ত্র বলে পরিচিত পশ্চিমা দেশগুলোর গণতন্ত্রেও ক্ষয় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্রের এই বৈশ্বিক সংকটের মাত্রা ও পরিধি বিষয়ে ধারণা দেওয়া। গণতন্ত্রের এই সংকট নতুন কি না এবং শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র এই সংকটে কী করে উপনীত হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

গণতন্ত্রের সংকট, গণতন্ত্রের ঢেউ ও ভাটা, হাইব্রিড রেজিম, গণতন্ত্রের শত্রু।

ভূমিকা

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কিকে ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানসূচক ওয়েল লেকচার প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালে লাস্কি যে তিনটি বক্তৃতা দেন, তার শিরোনাম ছিল 'ডেমোক্রেসি ইন ক্রাইসিস'। তাঁর এই বক্তৃতার পরিবর্ধিত ভাষ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে। ওই বক্তৃতাগুলো এবং বইয়ের মূল কথাই ছিল যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক গণতন্ত্রের

ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। ব্রিটেনের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র বিষয়ে তিনি সে সময়ে এই উপসংহারে পৌঁছান যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষত আইনসভা, ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে (লাস্কি ১৯৩৫)। হ্যারল্ড লাস্কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ লক্ষ করেছিলেন, ইতালিতে ফ্যাসিজম এবং জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থান দেখছিলেন এবং বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার চেহারাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং বামপন্থী রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি এমন এক সময়ে এই বক্তব্য দেন, যখন চারিদিকে যুদ্ধংদেহী স্বৈরাচারী শাসকদের উত্থান ঘটছে। গত শতকের তিরিশের দশকে হ্যারল্ড লাস্কি ব্রিটেনের আর্থরাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের সংকটের কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন, তা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের সমালোচনা বলে চিহ্নিত করা গেলেও সেগুলোকে কেবল প্রচারণা বলে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। লাস্কি সে সময়ে ব্রিটেনের লেবার পার্টির সদস্য ও নীতিনির্ধারকদের একজন ছিলেন। তাঁর অবস্থান দলের ভেতরে ছিল তুলনামূলকভাবে অধিকতর বামপন্থী ঘরানার। লাস্কি গণতন্ত্রের সংকটের যেসব কারণ চিহ্নিত করেছিলেন, তার সব কটি কারণের সঙ্গে সবাই একমত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ ছিল না যে তিরিশের দশকের সেই সময়ে গণতন্ত্র এক বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়েছিল। আর এটা শুধু ব্রিটেনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সংকটের মাত্রা ও ব্যাপ্তি আরও বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে। জার্মানিতে হিটলারের উত্থান তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর পরপরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়।

লাস্কির এই বক্তব্যের চার দশক পর পশ্চিমা বিশ্বে আবার প্রশ্ন ওঠে, গণতন্ত্র কি সংকটে পড়েছে? ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সরকারপ্রধান, গবেষক ও বিশ্লেষকেরা এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। এসব আলোচনার প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ট্রাইলেটারেল কমিশন[১] নামের একটি গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি টাস্কফোর্সকে এ নিয়ে গবেষণার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই টাস্কফোর্স একটি রিপোর্ট তৈরি করে, যার শিরোনাম হচ্ছে 'দ্য ক্রাইসিস অব ডেমোক্রেসি: অন দ্য গভর্ন্যাবিলিটি অব ডেমোক্রেসিজ' (গণতন্ত্রের সংকট: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন প্রসঙ্গে)। এই রিপোর্টের তিনজন লেখক হচ্ছেন মিশেল ক্রোজিয়ার, স্যামুয়েল হান্টিংটন ও জোজি ওয়াতানুকি। তাঁদের এই প্রতিবেদনটি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে (ক্রোজিয়ার ১৯৭৫)। এই রিপোর্টের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে ষাটের দশকে পশ্চিম ইউরোপের সরকারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শরিক বা অংশীজনের সমাহার ঘটেছে এবং এই সরকারগুলোকে বিভিন্ন

রকমের দাবিদাওয়ার মোকাবিলা করতে হচ্ছে, যা সরকারের মতো একটা জটিল আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না; এতে করে এই সব সমাজ ক্রমেই শাসনের অযোগ্য বা আনগভর্ন্যাবল হয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপট ছিল যুক্তরাষ্ট্রে ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, যার মধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থেকে শুরু করে নাগরিক অধিকার আন্দোলন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ষাটের দশকে 'গণতান্ত্রিক উত্থান' পাবলিক এবং প্রাইভেট ক্ষেত্রে বিরাজমান 'কর্তৃত্ব'কে চ্যালেঞ্জ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে এই সময়ে 'পদসোপান, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও সম্পদ' (হায়ারার্কি, এক্সপার্টিজ অ্যান্ড ওয়েলথ) বড় ধরনের আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে। হান্টিংটন ও তাঁর সহযোগীদের জন্য ১৯৭৫ সালে গণতন্ত্রের সংকট ছিল শাসনের সংকট, গভর্ন্যাবিলিটির সংকট। আর তাঁরা এই সংকটের জন্য দায়ী করেছিলেন রাষ্ট্রের কাছে সাধারণ মানুষের আরও বেশি প্রত্যাশা।

বিংশ শতাব্দীর দুই পর্যায়ে, চার দশকের ব্যবধানে, আমরা গণতন্ত্রের সংকটের কথাই কেবল শুনতে পাইনি, এর কারণ হিসেবে আমরা স্পষ্টত দুটি পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যাও দেখতে পেয়েছি। এই দুই ব্যাখ্যা উৎসারিত হয়েছে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল যে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে, তা নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্রবিষয়ক আলোচনায় বিভিন্নভাবে সেগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক আদর্শ এবং শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র সংকটে নিপতিত হয়েছে, এমন কথা ১৯৭৫ সালের পর বিংশ শতাব্দীতে আমরা আর ব্যাপকভাবে শুনতে পাইনি। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে, গত এক দশক, বিশেষত কয়েক বছর ধরে, গণমাধ্যম থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত শিক্ষালয়, নীতিনির্ধারক থেকে গবেষক, রাজনীতিবিদ থেকে সাধারণ নাগরিক—সবার আলোচনায় বারবার বলা হচ্ছে, গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে। এই আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘটমান শাসনের দিকে তাকিয়েও সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

এই পটভূমিকায় এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে, গণতন্ত্রের এই বৈশ্বিক সংকটের মাত্রা ও পরিধি বিষয়ে ধারণা নেওয়া। আমি দেখতে চাইব যে গণতন্ত্রের এই সংকট নতুন কি না এবং শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র এই সংকটে কী করে উপনীত হয়েছে। এই আলোচনা গণতন্ত্রের এ সংকটের কারণ অনুসন্ধানে সাহায্য করবে বলেই আশা করি।

গণতন্ত্রের সংকটের মাত্রা

গণতন্ত্রের কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই; এ নিয়ে বিভিন্ন রকমের বিতর্ককে দুভাবে

বিভক্ত করে তা বলা যায়। এর একটি হচ্ছে আদর্শিক (Normative), অন্যটি অভিজ্ঞতালব্ধ (Empirical)। প্রথম ধারা বলে গণতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত, দ্বিতীয় ধারা ব্যাখ্যা করে কার্যত গণতন্ত্র কীভাবে কাজ করে (রীয়াজ ২০১২)। সাম্প্রতিক কালে গণতন্ত্রের সংকটবিষয়ক যেসব আলোচনা রয়েছে, সেখানে গণতন্ত্রের একেবারে ন্যূনতম বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে—শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব আছে কি না, নাগরিকদের যেসব মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, সেগুলো পালিত হচ্ছে কি না এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের জবাবদিহির গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা আছে কি না। গণতন্ত্রের মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখেই বলা হচ্ছে, গণতন্ত্র সংকটের মুখোমুখি। এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ১. সর্বজনীন ভোটাধিকার; ২. আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের প্রধানের পদের জন্য নিয়মিত, অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন; ৩. মতপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতাসহ সব ধরনের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি সম্মান এবং আইনের শাসন, যার আওতায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও নাগরিক আইনিভাবে প্রকৃত অর্থেই সমানভাবে বিবেচ্য। এগুলো কেবল যে গণতন্ত্রের ন্যূনতম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত—তা-ই নয়, এগুলো হচ্ছে আনুষ্ঠানিক (Formal) গণতন্ত্রের সহজদৃষ্ট লক্ষণ, এমনকি সারবস্তুর (Substantive) গণতন্ত্রেরও বিষয় নয়। সারবস্তুর বিবেচনায় গণতন্ত্রের এর চেয়েও অনেক বেশি শর্ত পূরণ করতে হয়।

এই ন্যূনতম গণতন্ত্রের বিবেচনায় সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের অবস্থাটি কী, সেটার তথ্য পাওয়া যায় ফ্রিডম হাউসের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ইকনোমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রকাশিত বার্ষিক র‍্যাঙ্কিংয়ে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফ্রিডম হাউসের ২০১৮ সালের প্রতিবেদনের শিরোনাম হচ্ছে 'ডেমোক্রেসি ইন ক্রাইসিস' (ফ্রিডম হাউস ২০১৮)। ফ্রিডম হাউস একটি দেশে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের বিবেচনায় সারা পৃথিবীর দেশগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে—মুক্ত, আংশিক মুক্ত এবং একেবারেই মুক্ত নয়। এই হিসাবে ২০১৭ সালে পৃথিবীর ১৯৫টি দেশের মধ্যে ২৫ শতাংশ দেশ ছিল 'একবারে মুক্ত নয়' তালিকায় এবং 'আংশিক মুক্ত' তালিকায় ছিল ৩০ শতাংশ; ৪৫ শতাংশ দেশকে তারা বিবেচনা করেছে 'মুক্ত' বলে (ফ্রিডম হাউস ২০১৮, ২)। তাদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর ৭ দশমিক ১ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৩৭ শতাংশ মানুষ বাস করে 'মুক্ত নয়'—এমন ব্যবস্থার অধীনে, ২৪ শতাংশ বাস করে 'আংশিক মুক্ত' ব্যবস্থায় এবং ৩৯ শতাংশ বাস করে 'মুক্ত' ব্যবস্থার অধীনে। অর্থাৎ মোট ৬১ শতাংশ মানুষের বাস এমন ব্যবস্থায়, যাকে মুক্ত বলে বর্ণনা করা যাবে না। ফ্রিডম হাউস বলছে যে, গণতন্ত্রের এই অধোগতি চলছে ১৩ বছর ধরে। এই হিসেবে

১৯৮৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত যে ধারা ছিল, তাতে মুক্ত দেশের হার ছিল ক্রমবর্ধমান, বিপরীতে একেবারে 'মুক্ত নয়' বা অগণতান্ত্রিক দেশের হার ছিল ক্রমহ্রাসমান; কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে সেই ধারা বদলে গেছে (চিত্র ১)।

চিত্র-১ : গণতান্ত্রিক দেশের হার, ১৯৮৭-২০১৭

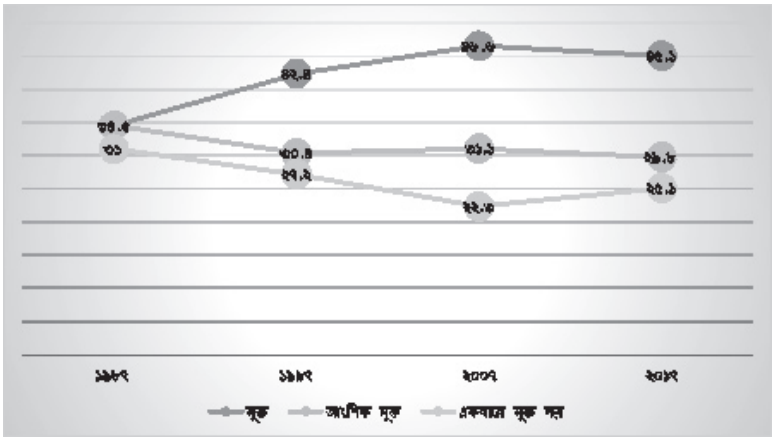

সূত্র : ফ্রিডম হাউস, ২০০৮, ৪

ব্রিটেনের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *ইকনোমিস্ট*-এর গবেষণা বিভাগ ইকনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) প্রতিবছর ১৬৭ দেশের গণতন্ত্রের মান বিশ্লেষণ করে। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই র‍্যাঙ্কিং করা হতো প্রতি দুই বছরে; ২০১১ সাল থেকে তা বার্ষিক রূপ নেয়। ২০০৬ সাল থেকে শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেশগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়—পূর্ণ গণতন্ত্র, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, হাইব্রিড রেজিম (দোআঁশলা ব্যবস্থা) ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা। পূর্ণ গণতন্ত্র হচ্ছে সেসব দেশ, যেখানে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেবল সংরক্ষিতই নয়, উপরন্তু এমন রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজমান, যাতে গণতান্ত্রিক নীতিগুলো বিকাশের অনুকূল পরিবেশ আছে। স্বাধীন বিচার বিভাগ, সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্য (চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস), গণমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য এই ব্যবস্থার উপাদান। ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র হচ্ছে এমন শাসনব্যবস্থা, যেখানে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু এবং নাগরিকের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার অন্যথা ঘটে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবিকশিত এবং শাসনব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে। হাইব্রিড রেজিম হচ্ছে সেই শাসনব্যবস্থা, যেখানে নির্বাচনে এমন ধরনের ত্রুটি আছে, যার কারণে এগুলো অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে

না, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনুপস্থিত বা সীমিত, ব্যাপক দুর্নীতি উপস্থিত, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে হয়রানি চালানো হয় এবং সেগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। কর্তৃত্ববাদী শাসন হচ্ছে যেখানে বহুত্ববাদী রাজনীতি অনুপস্থিত, এগুলো হয় একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বা একনায়কের অধীন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো গুরুত্বহীন, নাগরিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ স্বাভাবিক ঘটনা, যদি নির্বাচন হয়ও, তবে তা একেবারেই সুষ্ঠু ও অবাধ নয়। বিচার বিভাগ স্বাধীনতা ভোগ করে না; সেন্সরশিপ বহাল থাকে এবং সরকারের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয় (ইআইইউ ২০১৫)। এই সংজ্ঞার আলোকে ২০১৭ সালে পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হচ্ছে ১৯, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র ৫৭, দোআঁশলা ব্যবস্থা ৩১ এবং কর্তৃত্ববাদী ৫২টি (ইআইইউ ২০১৮)। ইআইইউর হিসাবের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে গত ১২ বছরে অগণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা বাড়ছে (চিত্র ২)।

চিত্র-২ : গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা, ২০০৫-১৭

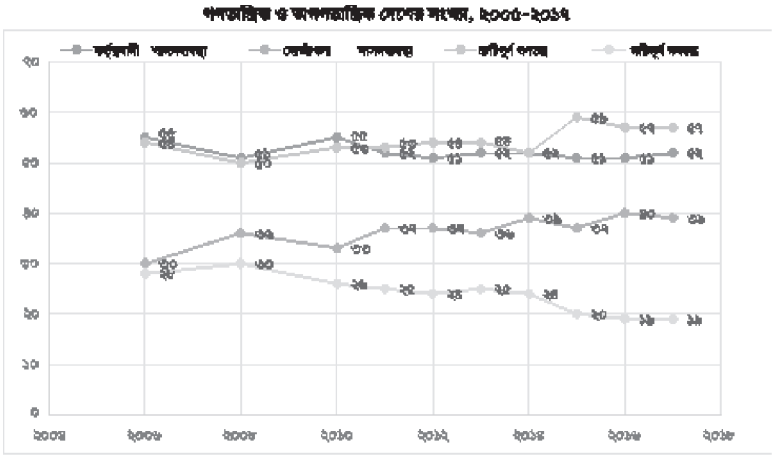

সূত্র : ইআইইউ, বিভিন্ন বছরের প্রতিবেদন

ইআইইউয়ের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে। কার্যত ৫০ শতাংশের বেশি মানুষের বাস এমন সব দেশে, যেগুলো হয় কর্তৃত্ববাদী, নতুবা দোআঁশলা ব্যবস্থা (সারণি ১)। শুধু তা-ই নয়, ২০০৬ সাল থেকে কার্যত কর্তৃত্ববাদী

শাসনের আওতায় বসবাসকারীর সংখ্যা কমলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করেন, এমন মানুষের হারও কমেছে নাটকীয়ভাবে।

সারণী-১ : গণতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসংখ্যার বাস

বছর	কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা	দোআঁশলা শাসনব্যবস্থা	ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র	পরিপূর্ণ গণতন্ত্র
২০১৭	৩৪	১৬.৭	৪৪.৮	৪.৫
২০১৬	৩২.৭	১৮	৪৪.৮	৪.৫
২০১৫	৩৪.১	১৭.৫	৩৯.৫	৮.৯
২০১৪	৩৭.৬	১৪.৪	৩৫.৫	১২.৫
২০১৩	৩৭.	১৬	৩৬	১১
২০১২	৩৭.১	১৪.৪	৩৭.২	১১.৩
২০১১	৩৭.৬	১৪	৩৭.১	১১.৩
২০১০	৩৬.৫	১৪	৩৭.২	১২.৩
২০০৮	৩৪.৯	১৫.২	৩৫.৫	১৪.৪
২০০৬	৩৮.৩	১৩	৩৮.২	১০.৫

সূত্র : ইআইইউ, বিভিন্ন বছরের প্রতিবেদন; https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/

ফ্রিডম হাউস ও ইআইইউর এসব তথ্যের বাইরেও বিভিন্ন ধরনের সূচকের বিচারেও এটা স্পষ্ট যে, পৃথিবীজুড়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি, গত কয়েক বছরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হ্রাস হয়েছে এবং এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে। এই অবস্থার সূচনা হঠাৎ হয়নি। ২০১৫ সালে ল্যারি ডায়মন্ড উল্লেখ করেছিলেন যে ১৯৭৫ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে, তারপর থেকেই শুরু হয়েছে 'মন্দা'র সময় (ডায়মন্ড ২০১৫)।

গণতন্ত্রের ঢেউ থেকে মন্দার পথে

পৃথিবীজুড়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রার কথা ল্যারি ডায়মন্ড উল্লেখ করেছেন, তা বোঝার জন্যে স্যামুয়েল হান্টিংটনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। হান্টিংটন ১৯৯১ সালে প্রকাশিত এক গ্রন্থে বলেন, শাসনব্যবস্থা হিসেবে ইতিহাসে তিন দফা গণতন্ত্রের প্রসার হয়েছে; একে তিনি বলেন 'গণতন্ত্রের তিন ঢেউ' (হান্টিংটন ১৯৯১)। প্রথম ঢেউয়ের ঘটনা ১৮২৬ থেকে

১৯২৬ সাল। ১০০ বছরে ৩৩টি দেশ স্বৈরতন্ত্র থেকে পরিবর্তিত হয়ে গণতন্ত্র বা আধা গণতন্ত্রে রূপ নেয়। দ্বিতীয় ঢেউ দেখতে পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যার শেষ হয়েছে ১৯৬২ সালে। এ সময়ে ৪১টি দেশ গণতন্ত্রকে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে, মোট গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২। তৃতীয় ঢেউয়ের সূচনা হয় ১৯৭৪ সালে, পর্তুগালে গণতন্ত্রের সূচনার মধ্য দিয়ে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সাল, যখন হান্টিংটনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন আরও ৩৫টি দেশ গণতন্ত্রের পথে শরিক হয়েছে, মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫। ২০১৩ সালে এসে এই হিসেবে নতুন গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯২, মোট গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২২। ১৯৭৩ সালে সারা পৃথিবীর মোট দেশের এক-চতুর্থাংশ ছিল গণতান্ত্রিক, ১৯৮০ সালে তা দাঁড়ায় এক-তৃতীয়াংশে এবং ১৯৯২ সালে প্রায় অর্ধেকে। নব্বইয়ের দশকে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে একদলীয় শাসনের অবসান থেকে এটাই বোঝা গেল যে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

হান্টিংটন অতীত ইতিহাসের দিকে চোখ রেখে এ-ও বলেছিলেন যে প্রতিটি ঢেউয়ের পর একটা বিপরীত স্রোত দেখা গেছে। একে আমরা ভাটার টান বলে চিহ্নিত করতে পারি। গণতন্ত্রের ভাটার টানের সূচনা হয় কার্যত জোয়ারের সময়েই। প্রথম ভাটার ক্ষেত্রে টানের সূচনা হয়েছিল ১৯২২ সালে ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে। সেই বিপরীত স্রোতের চূড়ান্ত অবস্থা দেখতে পাই ১৯৪২ সালে। সে সময় সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১২। দ্বিতীয় ঢেউয়ের চূড়ান্ত সাফল্যের অব্যবহিত পরে ১৯৬২ সালে সূচনা হয় দ্বিতীয় ভাটার টান। ১৯৭৪ সাল নাগাদ সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০। ১৯৯১ সালে তাঁর গবেষণা শেষে হান্টিংটন আশঙ্কা করেছিলেন যে খুব শিগগির ভাটার টান আসবে।

গণতন্ত্রের ঢেউ এবং ভাটার টানের প্রবাহের দিকে তাকালে আমাদের কাছে একটা বিষয় স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে, তা হলো প্রতিবারই কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ দেশ গণতন্ত্রের পথ থেকে সরে গেছে। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আমাদের লক্ষ করা দরকার—প্রথমত, প্রথম দুই দফায় যারা ভাটার টানে যোগ দিয়েছে, সেই দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ভাটার টানের একটা অন্যতম কারণ। আশির দশকের মাঝমাঝিতে যখন রাজনীতি থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারের সূচনা হয়, তখন সাধারণভাবে বেসামরিক প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় (মনিরুজ্জামান ১৯৮৭)। গণতন্ত্রায়ণের জন্যে এটি একটি সুসংবাদ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের এটাও স্মরণ করা দরকার যে গণতন্ত্রের এই বিকাশকে অত্যন্ত সীমিত মাপকাঠি দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছিল। তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যপর্যায় পর্যন্ত গণতান্ত্রিক হওয়া না হওয়ার বিষয়টি প্রধানতই বিবেচিত হয়েছে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপরে। ফলে এগুলোকে ইলেক্টোরাল ডেমোক্রেসি বা নির্বাচনী গণতন্ত্র বলেই বিবেচনা করা যথাযথ। বিষয়টির দিকে প্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করেন টেরি কার্ল; একে তিনি বর্ণনা করেন ইলেক্টোরালিজম বলে (কার্ল ২০০০); ডায়মন্ড এই প্রবণতাকে বলেন 'ফ্যালাসি অব ইলেক্টোরালিজম' (ডায়মন্ড ১৯৯৬), বাংলায় একে আমরা নির্বাচনের প্রতারণা বললে অতিরঞ্জন হবে না। এ পর্যায়ে এটা দৃশ্যমান হয় যে, অনেক স্বৈরাচারী বা কর্তৃত্ববাদী শাসকও নির্বাচনের আয়োজন করে নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে জাহির করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এগুলো থেকে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। পক্ষপাতমূলক ও সাজানো নির্বাচনের বিস্তার লাভ করায় অনেক গবেষকের মতে নির্বাচনী প্রতারণা এই সময়ের একটি বড় লক্ষণ (ভ্যান হ্যাম ২০১২)। এই পটভূমিকার মধ্যেই ১৯৯৬ সালে ল্যারি ডায়মন্ড প্রশ্ন তোলেন, গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউয়ের অবসান হয়েছে কি না (ডায়মন্ড ১৯৯৬)।

চিত্র-৩ : গণতন্ত্রের ঢেউ ও ভাটা, ১৮২৬-২০১৩

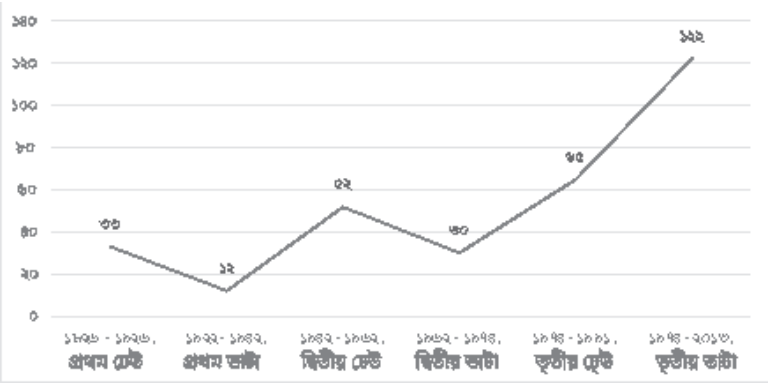

সূত্র : বিভিন্ন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে লেখকের তৈরি

এই সংশয় ও সন্দেহ এবং নির্বাচনী গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার দিকগুলো প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও দেশে দেশে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার এই ঢেউকে এক বড় ধরনের অর্জন বলেই বিবেচনা করা হতে থাকে; কেউ কেউ বিংশ শতাব্দীকে গণতন্ত্রের শতক বলে বর্ণনা করেন। এই আশাবাদ অতিশয়োক্তিরও জন্ম দেয়। ফ্রান্সিস

ফুকুইয়ামা ঘোষণা করেন, আমরা ইতিহাসের 'সমাপ্তি' প্রত্যক্ষ করছি (ফুকুইয়ামা, ১৯৮৯, ১৯৯১)। এই অতিশয়োক্তির পেছনে কারণ সম্ভবত এই যে দৃশ্যত গণতন্ত্রকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল প্রকৃত গণতন্ত্র হিসেবে। কিন্তু কিছু গবেষক ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বলতে শুরু করেন যে তৃতীয় ঢেউয়ের সব 'গণতান্ত্রিক' দেশই গণতন্ত্রের সারবস্তুকে ধারণ করে না। তদুপরি কিছু কিছু দেশ ইতিমধ্যেই পেছনে যাত্রা শুরু করেছে, গণতন্ত্রের কেবল মন্দাই শুরু হয়েছে—তা নয়, আগের দুই দফার মতোই 'রিভার্স ওয়েভ'-এর সূচনা হয়েছে। এই দফায় যেহেতু সবচেয়ে বেশি দেশ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে, তাই আগের তুলনায় উল্টো যাত্রা করা দেশের সংখ্যাও হবে বেশি। কেউ কেউ বললেন, যেহেতু সংখ্যাটি অনেক উঁচুতে, তার পতনের কষ্টও হবে আগের চেয়ে বেশি।

আগের দুই দফায় গণতন্ত্রের রিভার্স ওয়েভে দেশগুলো যেমন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে গিয়েছিল, ক্ষেত্রবিশেষে সেনাশাসনের উদ্ভব ঘটেছিল, এ ক্ষেত্রে যে তা ঘটছে না, সেটা সহজেই লক্ষণীয় হয়ে উঠল। কিছু কিছু দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণ দেখা গেলেও এ-ও দেখা গেল যে সেগুলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এমনকি সুষ্ঠু নির্বাচনের অধিকারও দেয় না। ক্ষমতা থাকে কেন্দ্রীভূত এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হয় সীমিত অথবা অনুপস্থিত। এ ধরনের ব্যবস্থাকেই ফরিদ জাকারিয়া ১৯৯৭ সালে ইললিবারেল ডেমোক্রেসি বা অনুদার গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করেন (জাকারিয়া, ১৯৯৭)। এ ধরনের ব্যবস্থার বিভিন্ন রকম রূপ লক্ষ করা গেল, যে কারণে বিভিন্ন গবেষক একে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করলেন; যেমন লেভিটস্কি এবং ওয়ে একে বর্ণনা করলেন কম্পিটিটিভ অথরিটারিয়ানিজম বলে (লেভিটস্কি ও ওয়ে ২০০২, ২০১০) এবং স্যাডলার একে চিহ্নিত করলেন ইলেক্টোরাল অথরিটারিয়ানিজম বা নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ বলে (স্যাডলার ২০০৬)। গণতন্ত্র থেকে পিছিয়ে পড়ার বিভিন্ন রকমের লক্ষণ এবং উপায় চিহ্নিত হলো (তমিনি ও ওয়েগম্যান ২০১৮)। ল্যারি ডায়মন্ড এ ধরনের সব ব্যবস্থাকেই একত্রে 'হাইব্রিড রেজিম' বা দোআঁশলা ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করার ধারা তৈরি করলেন (ডায়মন্ড ২০০২)। গবেষণায় দেখা গেল যে এ ধরনের রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের পথে যাত্রার মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হয়েছে। এগুলোকে ধীরগতিতে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসরমাণ মনে করার কারণ নেই; এগুলো নিজেই একটি নতুন ধরনের ব্যবস্থা—যা দৃশ্যত গণতান্ত্রিক, কিন্তু সারবস্তুর বিবেচনায় স্বৈরতান্ত্রিক।

এই নতুন প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া গেল বিভিন্ন অঞ্চলে; সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৯৯১ সালে যে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল, ২০১৭ সাল নাগাদ তার মাত্র ৬টি দেশকে গণতান্ত্রিক বলা যায়। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে

গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল, তাতে বিপরীত স্রোতের ধাক্কা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান ঘোষণা করেছেন, তিনি লিবারেল ডেমোক্রেসি নয়, ইললিবারেল ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করতে চান (*দ্য উইক*, ২০১৮)। পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রায়ণের সূতিকাগার বলে পরিচিত পোল্যান্ডের যাত্রা গণতন্ত্রের বিপরীতে, যেখানে মতপ্রকাশের অধিকার এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রায় অপসৃত (পাগানি ২০১৮)। ২০০৯ সালে ইরানের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রাকাঙ্ক্ষী 'সবুজ বিপ্লব' ক্ষমতাসীনদের হাতে পর্যুদস্ত হলো; ২০১১ সালে গণতান্ত্রিক মধ্যপ্রাচ্যের সম্ভাবনা নিয়ে যে আরব বসন্তের সূচনা হয়েছিল, তার পরিণতিতে একমাত্র তিউনিসিয়া ছাড়া আর কোথাও গণতন্ত্রের লেশমাত্র তৈরি হলো না। উপরন্তু বিভিন্ন দেশ গৃহযুদ্ধের শিকার হলো; মিসরে ফিরে এল সেনাশাসনের দুর্ভাগ্য।

এর পাশাপাশি দেখা গেল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ার বদলে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। রাশিয়ায় উত্থান ঘটল ভ্লাদিমির পুতিনের। তুরস্কে রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান সূচনা করলেন কার্যত এক ব্যক্তির শাসন। ভেনেজুয়েলাতে হুগো চাভেজের একচ্ছত্র শাসনের সূচনা হলো। ফিলিপাইনের রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন রদ্রিগো দুতার্তে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ধরনের শাসন দেখা গেল, তাকে গণতান্ত্রিক বলার সুযোগ থাকল না। দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে নরেন্দ্র মোদির ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর বহুত্ববাদিতার প্রতি চ্যালেঞ্জ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। অধিকাংশ মধ্য-এশীয় দেশগুলোর কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা তাঁদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে দশকের পর দশক ধরে অগণতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত রাখলেন।

গণতন্ত্রের যে দুর্দিন চলছে, এগুলো সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ সরবরাহ করে। তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে উঠতে শুরু করল, তা হলো যেসব দেশকে 'সুসংহত গণতান্ত্রিক দেশ' বলে বিবেচনা করা হতো, সেসব দেশেও গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয়ের বিরোধিতাকারী শক্তির উত্থান ঘটতে শুরু করেছে; জাতীয়তাবাদের নামে ফ্রান্সে ন্যাশনাল ফ্রন্ট, জার্মানিতে অলটারনেটিভ ফর জার্মানি, ব্রিটেনে ইউকে ইনডিপেনডেন্ট পার্টি বা অস্ট্রিয়ায় ফ্রিডম পার্টি—এ ধরনের দল ও গোষ্ঠীর উত্থানের ইঙ্গিত দিল (বিবিসি ২০১৮)। এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ওয়াশিংটনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির নিয়মিত প্রকাশনা *জার্নাল অব ডেমোক্রেসি*তে রবার্টো স্টেফান ফোয়া ও ইয়াশকা মাউঙ্ক প্রকাশিত প্রবন্ধ 'দ্য ডেঞ্জার অব ডিকনসলিডেশন' (বি-সুসংহতকরণের বিপদ) ব্যাপক বিতর্কের সূচনা করে। এই প্রবন্ধে তাঁরা দেখান যে ব্রিটেন, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের তরুণদের

গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার বয়স্কদের তুলনায় কম (ফোয়া ও মাউঙ্ক ২০১৬)। তাঁরা বলেন যে মিলেনিয়ালস, অর্থাৎ ১৯৮০ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করাকে তাঁদের আগের প্রজন্মের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁদের এই গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ভ্যালুস সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত। এই বিতর্কে অংশ নিয়ে অন্য গবেষকেরা এই গবেষণার পদ্ধতিগত ত্রুটির দিকে নির্দেশ করেন এবং এই উপসংহারের বিরোধিতা করেন (সিআরএফ ২০১৭)।

বিপরীতক্রমে অন্যান্য গবেষণায় এটাই দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির প্রতি পক্ষপাত, বহুত্ববাদের বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থাহীনতা বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বেশি (ভয়েটেন ২০১৬; আলেকজান্ডার ও ওয়েলজেল ২০১৭)। এডুয়ার্ডো কাম্পানালার ভাষায়, 'পেনশনার পপুলিজম' (পেনশনভোগীদের জনতুষ্টিবাদ) হচ্ছে গণতন্ত্রের একটি বড় চ্যালেঞ্জ (কাম্পানালা ২০১৮)। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, পোল্যান্ডের ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি, হাঙ্গেরির ফিদেজের ক্ষমতায় আরোহণের জন্য সবচেয়ে বেশি সমর্থন এসেছে বয়স্কদের কাছ থেকে। ইতালির নর্দান লিগের সাফল্যের চাবিকাঠি বয়স্কদের মধ্যকার অসন্তোষ। ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় ও তাঁর আচরণের প্রতি মার্কিন জনগণের এক বড় অংশের (সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও) সমর্থন প্রমাণ করে যে গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন হ্রাস পেয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যা বেশি।

'গণতন্ত্র কী করে মৃত্যুবরণ করে?'

গণতন্ত্রের সংকটবিষয়ক আলোচনা গবেষকদের সীমানা ছাড়িয়ে গণমাধ্যম এবং গণ-আলোচনা বা পাবলিক ডিসকোর্সের বিষয়ে পরিণত হয়েছে ২০১৫ সালের পর। কিন্তু এই বিষয়ে গবেষকেরা আগে থেকেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিলেন এবং তা কেবল ক্রমবর্ধমান হাইব্রিড রেজিমের কারণেই নয়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিরাজমান শাসনের অধোগতির কারণেও গণতন্ত্রের সংকটের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছিল। ২০১১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও তিন সপ্তাহের মধ্যেই এটি একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কোনো দাবিনামা না থাকলেও তা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং নতুন ধরনের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছিল, তা অনস্বীকার্য। এই আন্দোলনের সংগঠক ও অংশগ্রহণকারীরা এ অভিযোগ তুলেছিলেন যে বহুজাতিক করপোরেশন, বড় আকারের ব্যাংক ও ধনিকশ্রেণির প্রভাবে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে ব্যর্থ হচ্ছে।

এ সময়ে গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে বাম-মধ্য-দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যাঁর যাঁর আদর্শিক অবস্থানে দাঁড়িয়েই এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন। এর অসংখ্য উদাহরণের দুটি হচ্ছে ২০১৩ সালে প্রকাশিত জোসুয়া কুরলানজিকের গ্রন্থ *ডেমোক্রেসি ইন রিট্রিট : দ্য রিভোল্ট অব দ্য মিডল ক্লাস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডওয়াইড ডিক্লাইন অব রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট* (কুরলানজিক ২০১৩) এবং ডেভিড রান্সিম্যানের গ্রন্থ *দ্য কনফিডেন্স ট্র্যাপ : আ হিস্ট্রি অব ডেমোক্রেসি ইন ক্রাইসিস ফ্রম ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান টু দ্য প্রেজেন্ট* (রান্সিম্যান ২০১৩)। কুরলানজিক তাঁর বইয়ে বলেছিলেন যে প্রচলিত ধ্যানধারণায় বিশ্বনেতারা অন্ধ হয়ে আছেন। তাঁরা সংকটটা দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর ভাষায়, একাধিক কারণ গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করছে; এর মধ্যে আছে চীনের উত্থান, নতুন গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অভাব ও পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট। তিনি বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন না ঘটলে, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলো সমন্বিতভাবে অনেক দিন টিকে থাকার শক্তি রাখে। তবে এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব কম। অন্যদিকে রান্সিম্যান দেখিয়েছিলেন যে অতীতে বারবার সংকটে পড়া সত্ত্বেও গণতন্ত্র কী করে টিকে আছে; তাঁর বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি দেখান, কী করে গণতন্ত্র নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রসাদ ১৯১৮, ১৯৩৩, ১৯৪৭, ১৯৬২, ১৯৮৯ ও ২০০৮ সালে হতাশায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু রান্সিম্যান দেখান যে সংকট অবশ্যই ছিল, কিন্তু গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত টিকেছে; কেননা, গণতন্ত্র একধরনের বৃত্তচক্র তৈরি করতে পেরেছে। তাঁর ভাষায়, প্রতিবার সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র যতটুকু দরকার, নিজের ততটুকু পরিবর্তন ঘটায়। এতে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে, যা ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় আত্মতৃপ্তিতে। শুরু হয় আবার একই বৃত্তচক্র। এটাই হচ্ছে তাঁর ভাষায় কনফিডেন্স ট্র্যাপ—আত্মবিশ্বাসের ফাঁদ। গণতন্ত্র এই ফাঁদ এড়াতে পারে না।

এ ধরনের আলাপ-আলোচনায় বড় ধরনের গতি লাভ করে ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের বিজয় এবং ব্রিটেনের গণভোটে ব্রেক্সিটের পক্ষে জনসমর্থনের পর। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অন্যত্রও গণতন্ত্রের সংকটের চেহারা আরও স্পষ্ট হয়েছে এবং ফ্রিডম হাউস ও ইআইইউয়ের সূচকে অনেক দেশেই গণতন্ত্রের মৌলিক দিকগুলো যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, সেটা তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে এই আলোচনার মুখে বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যা সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে, কিছু কিছু গবেষক ট্রাম্পের উত্থান ও আচরণের সঙ্গে তিরিশের দশকের তুলনা করেন এবং আবারও ফ্যাসিবাদের উত্থানের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে আছে ডোনাল্ড রিচের *ডেমোক্রেসি ইন ক্রাইসিস : হোয়াই, হোয়্যার, হাউ টু রেসপন্ড* (২০১৭), ম্যাডেলিন অলব্রাইটের

ফ্যাসিজম: আ ওয়ার্নিং সাইন (২০১৮), ইয়াস্কা মৌঙ্কের *দ্য পিপল ভার্সেস ডেমোক্রেসি: হোয়াই আওয়ার ফ্রিডম ইজ ইন ডেঞ্জার* (২০১৮), ডেভিড রান্সিম্যানের *হাউ ডেমোক্রেসি এন্ডস* (২০১৮), স্টিভেন লেভিতস্কি ও ড্যানিয়েল জিবলেটের *হাউ ডেমোক্রেসিজ ডাই: হোয়াট হিস্ট্রি রিভিলস অ্যাবাউট আওয়ার ফিউচার* (২০১৮), জোনাহ গোল্ডবার্গের *সুইসাইড অব দ্য ওয়েস্ট: হাউ দ্য রিবার্থ অব ট্রাইবালিজম, পপুলিজম, ন্যাশনালিজম অ্যান্ড আইডেনটিটি পলিটিকস ইজ ডেস্ট্রয়িং আমেরিকান ডেমোক্রেসি* (২০১৮)। এসব গ্রন্থের এক বড় অংশজুড়ে আছে বিরাজমান সংকটের আলোচনা—পক্ষে অথবা বিপক্ষে।

গত এক দশকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমার জানি যে গণতন্ত্র যখন পেছনের দিকে যাত্রা করে, তখন কী পরিস্থিতি হয়। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়, ভিন্নমতের জায়গা মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়, সরকারবিরোধীদের জন্য যেকোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচ উধাও হয়ে যায়, মতপ্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতা যদি টিকেও থাকে, তবে তা সীমিত হয়ে যায়, গণমাধ্যমগুলোকে হয় কিনে নেওয়া হয় নতুবা সেন্সরশিপের মাধ্যমে মৌন করে দেওয়া হয়, আইনসভা হয়ে পড়ে দুর্বল ও অকার্যকর, বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের অধীন হয়ে পড়ে, সরকারবিরোধীদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়; সর্বোপরি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন একজন ক্যারিশম্যাটিক বক্তৃতাবাজ বা ডেমাগগ, যিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে সব জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করা তার পক্ষেই সম্ভব।

এসবের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে গণতন্ত্রের মৃত্যু, যা আলোচিত হয়েছে স্টিভেন লেভিটস্কি ও ড্যানিয়েল জিবলেটের *হাউ ডেমোক্রেসিজ ডাই: হোয়াট হিস্ট্রি রিভিলস অ্যাবাউট আওয়ার ফিউচার* বইটিতে। সম্ভবত এই সময়ের সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ এটি। স্টিভেন লেভিটস্কি ও ড্যানিয়েল জিবলেট তাঁদের এই গ্রন্থে দেখান কী করে যেকোনো দেশে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে। লন্ডনের দৈনিক *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় প্রকাশিত এই বইয়ের সারাংশে তাঁরা লেখেন, 'আজকের দিনে গণতন্ত্রের বিপথ যাত্রার সূচনা হয় ব্যালট বাক্সে। গণতন্ত্র ভেঙে পড়ার এই নির্বাচনী পথ খুবই বিভ্রান্তিকর। চিরায়ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যেমনটি আমরা দেখেছিলাম পিনোশের চিলিতে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে অবিলম্বে এবং তা সবার কাছে সহজেই প্রতীয়মান হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাসাদ আগুনে প্রজ্বলিত হয়। প্রেসিডেন্ট হয় নিহত হন অথবা আটক হন অথবা তাঁকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। সংবিধান হয় স্থগিত করা হয় নতুবা বাতিল। কিন্তু নির্বাচনের পথে এসবের কিছুই ঘটে না। রাজপথে ট্যাংকের দেখা মেলে না। সংবিধান ও অন্য নামমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথারীতি টিকে থাকে। লোকজন তখনো ভোট দেয়। নির্বাচিত স্বৈরশাসকেরা গণতন্ত্রের একটি বাহ্যিক আবরণ বহাল রাখেন। কিন্তু তখনই তাঁরা গণতন্ত্রের

সারবস্তুর প্রাণবায়ু বের করে ফেলেন' (লেভিটস্কি ও জিবলেট, ২০০৮)। দেশে দেশে গত এক দশকের কিছু বেশি সময় ধরে নির্বাচনের আড়ালে গণতন্ত্র যেভাবে নিহত হয়েছে, তার এক বাস্তবোচিত বর্ণনা হচ্ছে এটি। এরপর যা ঘটে, তা হচ্ছে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান স্বৈরাচারী শাসকেরা আর তাঁদের অনুগতরা বলে বেড়াতে থাকেন, গণতন্ত্র রক্ষা পেয়েছে, তা বিকশিত হচ্ছে।

যেকোনো রাষ্ট্র ও সমাজে যদিও এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র নিহত হওয়ার এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কিন্তু তা এক দিনে আবির্ভূত হয় না; কেবল রাজনীতির ভেতর থেকেও এই মুহূর্তের সূচনা হয় না। সমাজে সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার ধীরগতিতে অবসান, ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন এককে পরিণত করা (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাটোমাইজেশন), সমাজে ইতিবাচক সামাজিক পুঁজির (সোশ্যাল ক্যাপিটাল) হ্রাস, রাজনীতির ব্যাপারে অনীহা, ক্রমাগত ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে, গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীতে পার্থক্য বড় করে তোলা ও তার পুনরুৎপাদন হচ্ছে গণতন্ত্রের মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। গণতন্ত্রকে যাঁরা দুর্বল করতে চান, যাঁরা গণতন্ত্রের বদলে অন্য কোনো ধরনের শাসনের আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা পরিকল্পনা করেই সমাজে এসব দূষিত প্রবণতাকে উসকে দেন। রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে কলঙ্কিত করা ও তার বদলে অজ্ঞতার উদ্‌যাপন, ঐকমত্য তৈরিকারী ও বাস্তবোচিত সমঝোতায় বিশ্বাসীদের তাচ্ছিল্য করা এবং বিষোদ্‌গারকারী উগ্র মতাবলম্বীদের মেরুকরণ হচ্ছে এই পথে যাত্রার মাইলফলক (রনস্লি ২০১৮)। রাজনীতি ও সমাজের এসব জীবাণু যখন একত্র হয়, তখনই গণতন্ত্র মৃত্যুশয্যায় পতিত হয়।

গণতন্ত্রের 'শত্রু' কারা?

কারা গণতন্ত্রের শত্রু? এই প্রশ্ন আজকের নয়, অনেক পুরোনো এবং এর উত্তর কখনোই সহজ ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের চলমান সংকটে কারা এই শত্রু, তা তুলামূলকভাবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। যাদের হাতে গণতন্ত্রের মৃত্যু হবে বলে ষাট থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা সত্য হয়নি। ষাট ও সত্তরের দশকে যেমনটি অহরহই ঘটছিল যে সেনাবাহিনীর বুটের তলায় গণতন্ত্র পদদলিত হচ্ছিল, তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। সত্তর ও আশির দশকে যেভাবে বলা হচ্ছিল যে একদিন লাল পতাকা উড়িয়ে রাজধানী দখল করে কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রের অবসান ঘটাবেন, তা ঘটেনি। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি—যাদের মৌলবাদী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে—তারা একদিন তাদের তলোয়ার দিয়ে গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু বের করে ফেলবে বলে নব্বইয়ের দশকে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা-ও বাস্তব হয়নি। যদিও এটা ঠিক যে এ ধরনের অভিজ্ঞতার কিছু উদাহরণ আছে; যেমন থাইল্যান্ড ও মিসরে সেনাবাহিনীই ক্ষমতা দখল

করেছে, ভেনেজুয়েলায় বামপন্থীদের শাসনের সময়েই গণতন্ত্রের ক্ষয় হয়েছে এবং তুরস্ক ও ভারতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারীদের হাতেই গণতন্ত্র এখন ক্রমাগতভাবে অপস্রিয়মাণ, তথাপি এগুলো প্রধান প্রবণতা নয়।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দক্ষিণপন্থী জনতুষ্টিবাদী, যাঁরা জাতীয়তাবাদের নামে বিদেশভীতি (জিনোফোবিয়া) ও ইসলামভীতির (ইসলামোফোবিয়া) অস্ত্রে সজ্জিত, তাঁরাই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একধরনের ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং এযাবৎ অনেকটা সাফল্যও লাভ করেছেন (মার্টেনিলি ২০১৬)। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাঁদের সোচ্চার কণ্ঠস্বর, তাঁরা দাবি করছেন যে অর্থনৈতিকভাবে সমাজের প্রান্তিকে অবস্থানকারী ও এই ব্যবস্থায় যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা।

এই জনতুষ্টিবাদীদের গাত্রবর্ণ ভিন্ন, তাঁদের জেন্ডার ভিন্ন, তাঁদের মধ্যে ধর্মেরও পার্থক্য আছে। তাঁরা ভিন্ন ধরনের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের 'শত্রু নির্মাণে' সিদ্ধহস্ত। তাঁদের কেউ কেউ কথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'কে ব্যবহার করেছেন যৌক্তিকতা হিসেবে, অন্যদের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়ে উঠেছে জপমন্ত্র। তাঁরা তৈরি করেছেন এমন একধরনের অনুগত বাহিনী, যারা একই সঙ্গে গর্বিত (তাদের জাতি/দেশ/ধর্ম নিয়ে), অসন্তুষ্ট (তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে) এবং ক্রুদ্ধ (তাদের কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে)। তারা তাদের নেতাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; তারা তাদের নেতাদের পরিচ্ছদের প্রশংসায় মুখর, এমনকি যখন রূপকথার সেই শিশু সবার সামনেই বলে ফেলেছে, 'রাজার পরিধানে কোনো পোশাক নেই।'

এগুলো হচ্ছে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিক, কিন্তু কেবল অভ্যন্তরীণ কারণেই গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে—তা নয়; গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ কেবল দেহের অভ্যন্তরেই থাকে—তা-ও নয়। গণতন্ত্রের এই সংকটের পেছনে আছে বৈশ্বিক দিক, আছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। গত এক দশকে যেসব ক্ষমতাশালী অনুদার গণতন্ত্রের উত্থান ঘটেছে, তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও। চীন ও রাশিয়া হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ল্যারি ডায়মন্ড, মার্ক প্ল্যাটনার ও ক্রিস্টোফার ওয়াকার সম্পাদিত *অথারিটারিয়ানিজম গোজ গ্লোবাল* গ্রন্থে প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, যখন পশ্চিমের উদার গণতন্ত্রের দেশগুলো পশ্চাদপসরণ করেছে, যখন এসব দেশের নেতারা কর্তৃত্ববাদ মোকাবিলায় দুর্বলতা দেখিয়েছে, সে সময়ে কর্তৃত্ববাদী দেশগুলো আরও আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে। তারা জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটিকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের জন্য একত্রে কাজ করেছে, তারা সাইবার স্পেসের ওপর তাদের প্রভাব বাড়িয়েছে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি ব্যবহার করেছে গণতন্ত্রবিরোধী প্রচারণার

কাজে। তারা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, যাতে উদার গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় (ডায়মন্ড, প্ল্যাটনার ও ওয়াকার, ২০১৬)। তাঁদের এই বক্তব্যের পক্ষে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ট পরিমাণে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে এই প্রপঞ্চের প্রমাণ। এযাবৎ গণতন্ত্রের যে তিন ঢেউ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি কমিটেড দেশের উত্থান এবং তার বৈশ্বিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠানের সঙ্গে (বা হেজিমন হয়ে ওঠার সঙ্গে) গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বৈশ্বিক মন্দা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাকাঠামোয় বদল ঘটিয়েছে, বৈশ্বিক ব্যবস্থার সংস্কার ঘটিয়েছে এবং নতুন বিশ্বনেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে; এসব ঘটনার পরপরই আমরা দেখতে পেয়েছি যে গণতন্ত্রের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে (গুনিতস্কি ২০১৮)।

কেন এই সংকট?

এ প্রবন্ধের আলোচনায় কেন এই সংকট—তার সরাসরি উত্তরের সন্ধান করিনি। তবু তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে গণতন্ত্রের সংকটের পরিধি, মাত্রা ও রূপ বিষয়েই আলোচনা হয়েছে এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবেই এই সংকটের কারণ প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু সম্প্রতি আলোচনার প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠছে কারণ অনুসন্ধান, যাতে সমাধানের পথ খোঁজা সম্ভব হয়। এই আলোচনা এখনো পরিপক্ব হয়ে উঠেছে, তা বলা যাবে না। তবে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর একটি ধারা মনে করে, অর্থনৈতিক সংকট, বিশেষত বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে, এতে যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁরাই গণতন্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছেন যে গত কয়েক দশকে আত্মপরিচয়ের যে রাজনীতি (আইডেনটিটি পলিটিকস), তা-ই গণতন্ত্রের মূল বিষয়গুলোকে দুর্বল করেছে (ফুকুইয়ামা ২০১৮)।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টিকে যাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকেই এই ধারণার পক্ষে উদাহরণ দেন। তাঁদের এই যুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয় অভিবাসন প্রসঙ্গ। এসব যুক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের মনোযোগ দাবি করে। কিন্তু সেগুলো সর্বজনীন কি না, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা, এশিয়া ও আফ্রিকায় তার বিপরীত উদাহরণ বিস্তর। থাইল্যান্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণিই গণতন্ত্রের বিপরীতে সেনাশাসনের সবচেয়ে বড় সমর্থক হিসবে আবির্ভূত হয়েছে; ভারতে ১৯৯১ সালের উদারনীতি ও বিশ্বায়নের যারা সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী, যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছে, তারাই বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ শক্তির সমর্থক; বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে অর্থনীতি যতই বিশ্বায়নের সুযোগ

পেয়েছে এবং তার ফলে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, তারাই দেশের 'হাইব্রিড রেজিমের' সমর্থকের ভূমিকা নিচ্ছে। আফ্রিকায় তানজানিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু গণতন্ত্র অপসৃত এবং তার সমর্থক হচ্ছে সুবিধাভোগী বিত্তশালী ও মধ্যবিত্তরা। এসব দেশে অভিবাসন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, সেটা সবাই-ই জানেন। অন্যদিকে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি যে কেবল বিভাজন সৃষ্টি করে, তা কি নিশ্চিত করে বলা যাবে? এই আত্মপরিচয়ের রাজনীতির যে অর্থনৈতিক দিক আছে, তা অস্বীকার করার উপায় কোথায়?

এই দুই ধারার ব্যাখ্যার বাইরেও অনেক কিছু বিবেচনা দাবি করে এবং একই সঙ্গে এগুলোকে বিবেচনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই বলা যায়। তবে মনে রাখা দরকার যে এখনো আমরা এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর জানি না যে কেন গণতন্ত্রের এই সংকট তৈরি হয়েছে।

উপসংহার

বৈশ্বিকভাবে গণতন্ত্র যে সংকটের মুখে আছে, সে বিষয়ে সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র যে ধরনের সমতার প্রতিশ্রুতি দেয়—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—অনেক ক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন হয়নি। শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের অনেক অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নতুন গণতন্ত্রের দেশগুলোর একাংশে ক্ষমতাসীনরা গণতন্ত্রকে কেবল লেবাসে পরিণত করেছে। এর ফলে উদ্ভব হয়েছে হাইব্রিড রেজিমের। অন্যদিকে সুসংহত গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যে জবাবদিহি থাকা দরকার, তাতে ব্যত্যয় হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশেষত বিশ্বায়ন যতটা সম্পদ তৈরি করেছে এবং করছে, ততটা সমভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। এগুলো নিশ্চয় বিভিন্নভাবে নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে/করছে। কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদি বিবেচনা প্রমাণ করে যে এ ধরনের সংকট গণতন্ত্রের জন্যে একেবারে নতুন নয় এবং এখন যে বিপরীত স্রোত, তা কাছে থেকে যতটা বড় আকারের মনে হচ্ছে, ঠিক ততটা বৃহৎ নয়। একে মোকাবিলা করার উপায় হচ্ছে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করা, সেগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তার পথ অনুসন্ধান করা। গণতন্ত্র কোনো নিশ্চল ধারণা নয়। অতীতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন ঘটেছে। বিরাজমান সংকট সেই সংস্কারের তাগিদ তৈরি করেছে এবং তা যে অবশ্যকরণীয়, সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

গণতন্ত্র যত সংকটেই নিপতিত হোক, এ কথা বিস্মৃত হওয়ার সুযোগ নেই যে গণতন্ত্র অর্থ সংখ্যাগুরুর উৎপীড়ন নয়, এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়—গণতন্ত্র

হচ্ছে সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ, সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি, আইনের চোখে নাগরিকের সমতা, ভিন্নমতের অধিকার, ক্ষমতাসীনের জবাবদিহির ব্যবস্থা। শুধু অব্যাহত চর্চার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্রকে ত্রুটিমুক্ত ও আরও বেশি কার্যকর করা সম্ভব—এর কোনো বিকল্প নেই। এযাবৎ যত আদর্শ শাসনব্যবস্থার কথা আমরা জানি, তার মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা, যেখানে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও বদলানোর পদ্ধতি রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কারণেই গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার বিকল্প নেই।

টীকা

১. জাপান, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নীতিনির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত এবং গবেষকদের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ট্রাইলেটারেল কমিশন। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং এই বিষয়ে পরামর্শ প্রদান। প্রতি তিন বছরে এর মেয়াদকাল বাড়ানো হয়। এই কমিশন এখনো সক্রিয়। আদর্শিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে রক্ষণশীল বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র

Albright, Madeleine. *Fascism: A Warning*. New York: Harper; 2018

Alexander, Amy C. and Christian Welzel. 'The Myth of Deconsolidation: Rising Liberalism and the Populist Reaction.' *Journal of Democracy*, Online Exchange on "Democratic Deconsolidation". April 2017.

BBC, Europe and nationalism: A country-by-country guide, September 10, 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006

Campanella, Edoardo. 'Is Pensioner Populism Here to Stay?' *Project Syndicate*, October 10, 2018, https://www.project-syndicate.org/commentary/aging-populations-fuel-pensioner-populism-by-edoardo-campanella-2018-10

Constitutional Rights Foundation (CRF), 'Is Democracy in Trouble?' Bill of Rights in Actions (BRIA), Vol 33, no. 1, Fall 2017, http://www.crf-usa.org/images/pdf/gates/IsOurDemocracyInTrouble.pdf

Crozier, Michel, Samuel P. Huntington and Joji Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of*

Democracies to the Trilateral Commission, New York: NYU Press, 1975.

Diamond, Larry J. 'Facing up the democratic recession,' *Journal of Democracy*, Vol 26, No. 1, January 2015, 141-155, p. 141.

Diamond, Larry J. 'Is the Third Wave Over?,' *Journal of Democracy*, Vol. 7, No. 3, July 1996. pp. 20-37

Diamond, Larry. 'Thinking about Hybrid Regimes', *Journal of Democracy*, Vol. 13, No. 2, 2002, pp. 21-35.

Diamond, Larry. Marc F. Plattner, and Christopher Walker (eds.), *Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016.

Economist Intelligence Unit EIU), 'Democracy Index.' http://www.eiu.com/topic/democracy-index

Foa, Roberto Stefan and Yascha Mounk. The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect. *Journal of Democracy*, Volume 27, No. 3 July 2016, pp. 5-17.

Freedom House, 'Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis.' Washington D.C.: Freedom House. 2018. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2018_Final_SinglePage.pdf

Fukuyama, Francis, 'The End of History?', *The National Interest*, Summer, 1989.

Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press, 1991.

Fukuyama, Francis. 'Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy.' *Foreign Affairs*, September-October 2018.

Goldberg, Jonah. *Suicide of the West: How the Rebirth of Tribalism, Populism, Nationalism, and Identity Politics is Destroying American Democracy*, New York: Crown, 2018

Gunitsky, Seva. 'Democracy's Future: Riding the Hegemonic Wave', *The Washington Quarterly*, Vol. 41, no. 2, 2018, pp. 115-135.

Karl, Terry J. 'Electoralism.' In R. Rose (Ed.), *International Encyclopedia of Elections*. London: Macmillan, 2000.

Laski, Harold J. *The Crisis of Democracy*. North Carolina: North Carolina Press, 1935.

Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt. *How Democracies Die: What History Reveals About Our Future*. New York: Crown, 2018

Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt, 'This is How Democracies Die,' *The Guardian*, January 21, 2018a.

Levitsky, Steven and Lucan A. Way. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Levitsky, Steven and Lucan A Way. 'The Rise of Competitive Authoritarianism', *Journal of Democracy*, Vol. 13 No. 2, 2002, pp. 51-65.

Martinelli, Alberto (ed.). *Populism on the Rise: Democracies Under Challenge?* Milano: Italian Institute for International Political Studies (ISPI), 2016.

Mounk, Yascha. *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Harvard University Press, 2018

Norris, Pippa. 'Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks', Faculty Research Working Paper Series, Harvard University. RWP17-012, March 2017, file:///C:/Users/aliri/Downloads/RWP17-012-Norris.pdf

Pogany, Stephen I. 'Europe's illiberal states: why Hungary and Poland are turning away from constitutional democracy.' *The Conversation*, January 4, 2018. http://theconversation.com/europes-illiberal-states-why-hungary-and-poland-are-turning-away-from-constitutional-democracy-89622

Rawnsley, Andrew. 'How Democracy Ends review – is people politics doomed?' *The Guardian*, 20 May 2018

Rich, Ronald. *Democracy in Crisis: Why, Where, How to Respond*. Lynne Rienner Publishers, 2017

Runciman, David. *How Democracy Ends*. New York: Basic Books, 2018

Runciman, David. *The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present*. Princeton, N.J: Princeton University Press. 2013.

Schedler, Andreas. 'The Logic of Electoral Authoritarianism' in Andreas Schedler (ed), *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*, Boulder, CO: Lynne Reiner, 2006.

Talukder Maniruzzaman, *Military Withdrawal from Politics: A Comparative Study*, London: Bellinger, 1987.

The Week, 'Hungary's 'illiberal democracy', April 22, 2018, https://theweek.com/articles/768453/hungarys-illiberal-democracy

Tomini, Luca and Claudius Wagemann, 'Varieties of contemporary democratic breakdown and regression: A comparative analysis,' *European Journal of Political Research*, Vol. 57, No. 3, August 2018, pp. 687-716.

Van Ham, Carolien, 'Beyond Electoralism? Electoral fraud in third wave regimes,' 1974-2009, Unpublished PhD Dissertation, European University Institute, Department of Political and Social Sciences, 2012, http://hdl.handle.net/1814/22694

Voeten, Erik. 'Are People Really Turning Away from Democracy?' (December 8, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2882878

Zakaria, Fareed. 1997, 'The Rise of Illiberal Democracy.' *Foreign Affairs*, November-December 1997.

রীয়াজ, আলী, 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ', *প্রতিচিন্তা*, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ৪৭-৬৮

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়ন

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীসহ সচেতন গোষ্ঠীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে গণতন্ত্র বিনির্মাণ এবং সংহতকরণে সব রাষ্ট্রনির্বিশেষে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরী এবং ভারসাম্যমূলক ভূমিকা পালনের বিকল্প নেই। অর্থাৎ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক এসব প্রতিষ্ঠানের আচরণ ও ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ড এবং জবাবদিহি অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নির্বাচনী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদ এবং রাজনীতি ও ক্ষমতাচর্চার মূল নিয়ামক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা তাই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ প্রবন্ধে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নে আবশ্যক এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

প্রাতিষ্ঠানিকায়ন, নির্বাচন, সংসদ, রাজনৈতিক দল।

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা, সংজ্ঞায়ন বা তত্ত্বের অবতারণা চলেছে। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতান্ত্রিক ডিসকোর্স ও ধ্যানধারণায় তাত্ত্বিকদের মধ্যে পার্থক্য, সহমত এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এসব ধারণা বা ব্যাখ্যা গণতান্ত্রিক ডিসকোর্সটিকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর করেছে। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে বহু অবয়বে ও বহুমাত্রিকতায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজভেদে বিভিন্নতা ও জটিলতা দেখা গেছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক যাত্রাপথে পশ্চিমা ধাঁচের উদারনৈতিক ধ্যানধারণার প্রাধান্য দেখা যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে অনেক নতুন রাষ্ট্রে তার অনুকরণ ও অনুসরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। তবে নতুন প্রেক্ষাপটে তাদের পথচলা বিভিন্ন

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা-সংকটে জর্জরিত হয়েছে। এভাবে অনেক রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসন, কর্তৃত্ববাদ, ফ্যাসাড গণতন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, একদলীয় শাসনসহ সংকর-জাতীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োগ হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের ফলে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের বিলুপ্তি ঘটে। নতুন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের নতুন পর্বের সূচনা হয়। এই প্রেক্ষাপটে পুনরায় পশ্চিমা গণতন্ত্রের ওপর ঝোঁক সৃষ্টি হয় এবং প্রায় সর্বত্রই তা অনুসরণীয় কাঠামো হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

বিশ্বায়নের স্রোতে গভর্ন্যান্স বা সুশাসন এবং গণতন্ত্রায়ণের মধ্যকার সাযুজ্য গুরুত্ব লাভ করে। তবে উন্নয়নশীল দেশে অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ণে প্রক্রিয়াগত এবং সারবস্তুগত ভারসাম্যের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্নধর্মী প্রবণতা দৃশ্যমান হতে থাকে। গণতন্ত্রের চিরাচরিত চারিত্রিক পরিমণ্ডলে বিচরণকারী কাঠামোগুলোর জবাবদিহি ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একবিংশ শতাব্দীর প্রায় দুই দশক গড়িয়েছে এবং এখন নতুনভাবে গণতন্ত্র, এর সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পর্যালোচনা হচ্ছে। পাশ্চাত্যে সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা যায় যে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় গণতান্ত্রিক রাজনীতি সম্পর্কে জনদৃষ্টিভঙ্গি আগের তুলনায় নেতিবাচক। সামাজিক সমস্যা নিরসনে এ রাজনীতি সম্পর্কে জনমতের ব্যাপক অংশে অবিশ্বাস, বিচ্ছিন্নতা, স্থবিরতা ও মোহময়তার অভাব দেখা যাচ্ছে। নেতিবাচক এ প্রক্রিয়ায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে ম্যাথু ফ্লিন্ডার্স উল্লেখ করেন যে একাবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হলেও বিশ্বব্যাপী প্রবণতা এ ক্ষেত্রে গলদ সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁর ভাষায়, 'Citizens around the world appear to have become distrustful of politicians, secptical about democratic institutions, and disillusioned about the capacity of democratic politics to resolve pressing social concerns.'[১]

উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে সমস্যা ও জটিলতা নতুন নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের স্খলন লক্ষণীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অস্বাভাবিক আচরণ প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রশ্নের উদ্রেক করে। তাত্ত্বিকদের বক্তব্য অনুসারে 'গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ'-এর পরবর্তী দশকগুলোতে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যা অভূতপূর্ব। তবে লক্ষণীয় যে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতি ঘটলেও বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক অধিকারের মাত্রা নিম্নগামী হয়েছে এবং গণতন্ত্রের নামে অনুদার কর্তৃত্ববাদ চালুর প্রবণতা দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'হাইব্রিড রেজিম'-এর

উদ্ভব এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যয়ী আচরণ ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গণতন্ত্রের সহায়ক শক্তিগুলোর জন্য নির্ধারিত জায়গা বা space সংকুচিত হয়ে যায়। উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, ল্যারি ডায়মন্ড উল্লেখ করেন যে 'space for opposition parties, civil society and the media is shrinking, and international support for them is drying up. Ethnic, religious and other identity cleavages polarize many societies that lack well designed democratic institutions to manage those cleavages. State structures are too often unable to secure order, protect rights, meet the basic social needs.'[২]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পারস্পরিক সম্পর্কের পরিমণ্ডলে সমস্যা দেখা গেলেও গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত কাঠামোর মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীসহ সচেতন গোষ্ঠীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে গণতন্ত্র বিনির্মাণ এবং সংহতকরণে সব রাষ্ট্রনির্বিশেষে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরী এবং ভারসাম্যমূলক ভূমিকা পালনের বিকল্প প্রকৃত পক্ষে নেই। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক এবং বাহক এসব প্রতিষ্ঠানের আচরণ ও ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ড এবং জবাবদিহি গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য অত্যাবশ্যক। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নির্বাচনী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদ এবং রাজনীতি ও ক্ষমতাচর্চার মূল নিয়ামক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা তাই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ প্রবন্ধে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নে আবশ্যক এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিকায়ন

রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকায়ন বলতে সংশ্লিষ্ট কাঠামো, নিয়মকানুন, ভূমিকা এবং চর্চায় বৈধ কর্তৃত্বের সম্পর্ক এবং যথাযথ আচরণ বোঝানো হয়। বস্তুত, বৈধতাই চর্চার ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করে এবং প্রতিষ্ঠানগত দক্ষতা ও সমন্বয় সাধনমূলক কর্মপন্থাকে স্বীকৃতি দেয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বা উপব্যবস্থার পৃথক্করণ নয়, বরং ক্ষমতার ভারসাম্য এবং ঈপ্সিত ফলাফল প্রাপ্তি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক পৃথক্করণ ভারসাম্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং এ প্রক্রিয়াটি গণতন্ত্র সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত।[৩]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটন প্রাতিষ্ঠানিকায়নের ক্ষেত্রে প্রধান চারটি উপাদান চিহ্নিত করেন। যেমন স্বাধীনতা, যা নির্দেশ করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও

বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা এবং অন্যান্য সংগঠনের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ; একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধারায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং টিকে থাকার কৃতিত্ব; একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কাঠামো নির্মাণ ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে দক্ষতা সৃষ্টি; এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজ নিজ কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্নকরণ, যাতে সময় ও প্রক্রিয়ার যথাযথ সমন্বয় ঘটে।[৪]

প্রাতিষ্ঠানিকায়নের আরেকটি ধারণা হচ্ছে, সংগঠনগুলোর কর্মযজ্ঞের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ণয় করে অগ্রসর হওয়া। ব্রানসন (১৯৯৯) যুক্তি দেখান যে প্রতিষ্ঠান চালনার ক্ষেত্রে মানদণ্ডের পদ্ধতিই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে গোয়েৎস এবং পিটারস দুটি চলক যথা সামঞ্জস্যতা (congruence) এবং স্বাতন্ত্র্য (exclusivity) সংযুক্ত করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো সংগতিপূর্ণ ও উপযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত রাখার তৎপরতা চালায়। এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মূল্যবোধগত পার্থক্যকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কাজেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা জানা প্রয়োজন। স্বাতন্ত্র্য-সম্পর্কিত চলকটি নির্ণয় করে প্রাতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার কার্যকরী প্রতিযোগিতা, যা তাদের টিকে থাকার জন্য আবশ্যক। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই কাজ করে থাকে, তখন তাদের প্রতিযোগিতার শান্তিপূর্ণ নিরসন প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৫]

সাংগঠনিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে সিশন উল্লেখ করেন যে 'The existence and persistence of valued rules, procedures and patterns of behavior enable the accommodation of new configurations of political claimants and or demands within a given organization'.[৬]

যাহোক, প্রাতিষ্ঠানিকায়নকে একাধারে প্রক্রিয়া এবং সাংগঠনিক বিন্যাসের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকায়ন এভাবে প্রক্রিয়া হিসেবে সাংগঠনিক পরিচায়কের উত্তরণ এবং চলমান সংস্কৃতি ও সম্মতির বৈধতা নির্দেশ করে। আচরণগত বিধিবিধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের বরাদ্দে স্বচ্ছতা আনয়ন জরুরি, যা অনিশ্চয়তা এবং দ্বন্দ্ব পরিহারে সক্ষম। কাজেই যথাযথ আচরণ অনুসরণ এবং মতৈক্য প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি নির্মাণ বিশেষ গুরুত্ববাহী, যা গণতন্ত্র সংহতকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[৭]

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালী অবস্থান, দক্ষতা, যথাযথ আচরণ এবং ফলপ্রসূ কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভরশীল। যেসব প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের ভিত্তি বা বুনিয়াদস্বরূপ তার মধ্যে অন্যতম হিসেবে নির্বাচন, সংসদ এবং রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে বিবেচ্য।

নির্বাচন

প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের মূল বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নির্বাচন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নির্বাচনকে শাসনব্যবস্থা বৈধকরণের এক কার্যকরী মাধ্যম, সমাজব্যবস্থার সংহতি, ব্যবস্থাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতা, অংশগ্রহণমূলক আচরণ এবং রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিতে যুক্ত হয়েই প্রতিযোগী রাজনীতিবিদেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর রেখে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের চলমান ইস্যুগুলোর মোকাবিলা করে। একই অবস্থায় তাঁরা বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং নিজ নিজ অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত করেন। বস্তুত, গণতন্ত্র বিনির্মাণে নির্বাচন অন্যতম সহায়ক শক্তি এবং সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করতে ভূমিকা রাখে। যেহেতু নির্বাচন নামক স্তম্ভের ওপরই গণতন্ত্র দণ্ডায়মান থাকে, সেহেতু নির্বাচনী কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং এর প্রাতিষ্ঠানিকায়নের মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব। কাজেই বলা যায় যে সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা নির্বাচনী সংস্থার সাফল্য বা দক্ষতা এবং সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিকায়ন নির্দেশ করে।

নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের নির্ধারক এবং এ ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক দায়দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এ সংস্থার কার্যপরিধি ও তৎপরতা নির্বাচকমণ্ডলী, প্রতিনিধিত্ব, দলীয় ব্যবস্থা, সংসদসহ সার্বিকভাবে গণতন্ত্র ও সহায়ক অংশীগোষ্ঠীগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এ কর্তৃপক্ষকে নিশ্চয়তা দিতে হয় যে গণতন্ত্রে নির্বাচন আবশ্যকরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, নির্দিষ্ট সময় অন্তর, সর্ব-অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুনির্দিষ্ট এবং নির্বাচকমণ্ডলীর পছন্দ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্বাচন-পূর্ববর্তী, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন-পরবর্তী দায়িত্ব পালন লক্ষণীয়। নির্বাচন-পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের মধ্যে থাকে নির্বাচনী রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ, বাজেট প্রণয়ন, নির্বাচনী আইন পর্যালোচনা, বিধি প্রণয়ন, ইলেক্টোরাল রোল প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, প্রার্থী বাছাই, রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন, তথ্য প্রকাশ, অর্থায়ন তদারকি, ভোটার এডুকেশন কর্মসূচি, নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগদান ও প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদি। নির্বাচনকালীন দায়দায়িত্ব হলো আচরণবিধি প্রয়োগ, নির্বাচনী প্রচার তদারকি, নির্বাচনী দ্বন্দ্ব নিরসন, ভোট গ্রহণ এবং ফলাফল ঘোষণা। নির্বাচন-পরবর্তী কর্মকাণ্ড হচ্ছে সহিংসতা রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ, নির্বাচনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। এ তিন পর্যায়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ও কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন নির্বাচনী সংস্থার ক্রিয়াশীলতা, তৎপরতা এবং মুক্ত স্বচ্ছ নির্বাচন করার দক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির পরিচায়ক।

আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুসরণীয় কতিপয় নীতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ, স্বচ্ছতা প্রদর্শন, আস্থা অর্জন এবং নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন। কার্ল ডানকান উল্লেখ করেন যে 'An electoral body however styled, is responsible for more than staging a poll on election day; it is the custodian of the integrity of a key phase in the democratic process. It must therefore act with impartiality and a maximum of transparency, consulting on a meaningful way with interested parties, before decisions are taken on important matters and being prepared to give reasons for such decisions.' [৮]

ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ এ প্রসঙ্গে যে প্রপঞ্চগুলো উল্লেখ করে তা হলো: সংহতি, পক্ষপাতহীনতা, স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, দক্ষতা, সেবা প্রদান এবং পেশাদারত্ব।[৯] অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানে যথাযথভাবে নির্ধারিত আইন এবং আচরণবিধি অনুসরণ, অংশীজনদের কাছে নিরপেক্ষতা প্রমাণে তাদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্মসম্পাদনে কোনো মহল কর্তৃক প্রভাবিত না হওয়া, তথ্য প্রদানে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, সম্পদ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া, অংশীগোষ্ঠী ও নির্বাচকমণ্ডলীকে যথাযথ সেবা প্রদান এবং প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনীর কর্মকাণ্ডে পেশাদারত্ব নিশ্চিতকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব ইতিবাচক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী গণতন্ত্রের লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হয় এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে অবদান রাখে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বৈধ আইনি কাঠামো নির্মাণ এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ এবং লক্ষ রাখা দরকার যে এ কাঠামো স্বাধীন নির্বাচনী সংস্থা গঠনে কতটুকু কার্যকর। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন ওই সংস্থার নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, কর্মকাণ্ড, দায়িত্বশীলতা, অংশীগোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক নির্ণয়, নির্বাচনী অভিযোগ বা ব্যত্যয় তদন্ত, বিচারিক পর্যালোচনা, নিজস্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান নির্দেশ করে কি না, তা জানা আবশ্যক (আইডিইএ)। এসব আইনের উৎস হয়ে থাকে সাধারণত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, অর্থাৎ সংবিধান, সংসদ প্রণীত বিধিবিধান, নির্বাচনসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনসমূহ, নির্বাচনী সংস্থার প্রণীত বিধি, নির্দেশনা এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর জন্য আচরণবিধি ইত্যাদি।

আইনি কাঠামোর পাশাপাশি নির্বাচন সংস্থার স্বাধীনতার মাত্রা নির্ণয়ও জরুরি, যা বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যে নির্বাচন সংস্থা বা কমিশন নিজস্ব দায়দায়িত্ব পালনে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে তা হলো স্বাধীন মডেল। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন নির্বাহীর কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং নিজস্ব অর্থায়ন বা বাজেট প্রণয়নে কর্তৃত্বসম্পন্ন। এ মডেলটি সাধারণত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে লক্ষণীয় হয়।

অন্য আরেকটি মডেল হলো ক্ষমতাসীন সরকার একটি যৌথ তদারকি সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করে, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিচারকমণ্ডলী বা আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অথবা তাঁদের মিশ্রিত রূপ এবং নির্বাচন তদারকি, পরিচালনাসহ বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন।

তৃতীয় মডেলটি হচ্ছে সার্বিকভাবে সরকার পরিচালিত নির্বাচনী ব্যবস্থা, যা সরকারের নির্বাচনী শাখা হিসেবে পরিচিত ও সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত এবং সরকারের নির্বাহী বা সংসদ কর্তৃক গঠন করা হয়। এটি 'ব্রাঞ্চ মডেল' হিসেবেও পরিচিত। আরও একটি মডেলের বিষয়ে জানা যায়, তা হলো 'মিশ্র মডেল'। এতে একটি স্বাধীন নির্বাচনী সংস্থা এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগ যৌথভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করে, যাতে সংস্থাটি নীতি প্রণয়ন এবং নীতি বাস্তবায়নে কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়। এ ছাড়া অন্যান্য মডেলের মধ্যে রয়েছে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকৃত নির্বাচনী সংস্থা, যেখানে জাতীয় কর্তৃত্বের শুধু সীমিত তদারকি বা সমন্বয়ের দায়িত্ব থাকে।

নির্বাচনী সংস্থার স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে বিভিন্ন মাপকাঠিতে বিচার্য, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কাঠামোগত, কার্যগত, আর্থিক এবং আচরণগত স্বাধীনতা। এ সংস্থাকে আইন বা সাংবিধানিক উপায়ে নির্বাহী শাখা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করলে তা হয় কাঠামোগত স্বাধীনতার ধরন। এর কার্যগত স্বাধীনতা হচ্ছে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে কয়েকটি ধাপে বিস্তৃত নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনায় যেকোনো বহিঃস্থ মহল, সরকার বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা। আর্থিকভাবে স্বাধীন নির্বাচন সংস্থা নিজস্ব বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয় প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষণে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে আর এ সংস্থার আচরণগত স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে এর সর্বময় কর্তাব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ধারণ এবং যেকোনো রকম রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চাপের ঊর্ধ্বে থেকে যুক্তিনির্ভর এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনসংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ড ও দায়দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

আলীম উল্লেখ করেন যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ তথা নির্বাচন কমিশনের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যেসব উপাদান আবশ্যক তা হলো : সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক্করণের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা; নির্বাচন পরিচালনায় কর্তৃত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন; আর্থিকভাবে স্বাধীনতা ভোগ; নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কর্মসম্পাদন; নিজস্ব কর্মী বাহিনী গঠন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময়োপযোগী যথাযথ সংস্কার সাধন।[১০] এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় নির্বাচনী সংস্থা তথা নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের, অর্থাৎ কমিশনারদের স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগদানের জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন, যাতে এসব কর্মকর্তার যোগ্যতা ও অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি অন্তর্ভুক্ত হয়। যেহেতু নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন এককভাবে সম্ভবপর হয় না, তাই এর সঙ্গে

সহায়ক শক্তিসমূহের কার্যকরী সম্পর্ক নির্মাণ আবশ্যক। এভাবে কমিশনের অংশীগোষ্ঠী বা মূল ভূমিকাধর হিসেবে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ও সংশ্লিষ্ট কাঠামোর যৌথভাবে নির্বাচনী কর্মসম্পাদন ফলপ্রসূ ফলাফল বয়ে আনে, যা গণতন্ত্র চর্চা ও এর প্রাতিষ্ঠানিকায়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

বাংলাদেশের প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাছে অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সর্ব অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণসমৃদ্ধ নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করা, যা বহুমাত্রিক সংকট যেমন সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের অভাব, সমন্বয়হীনতা, অদক্ষতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বান্দ্বিক সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতিসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং ভূমিকা পরিচালনাকারীদের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে জর্জরিত।

এ দেশে নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হলো নির্বাচন কমিশন এবং সংবিধানের সপ্তম ভাগে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে গঠন করা হয়, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন প্রধান নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে অনধিক চারজন কমিশনার। এ নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে ১১৮(৪) ধারা অনুযায়ী স্বাধীন এবং গণপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশের বিভিন্ন বিধি দ্বারা সমর্থিত। এসব বিধি মোতাবেক অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা সরকারের নিকট কমিশন নিজ কার্যক্রমের জন্য দায়বদ্ধ থাকে না। নির্বাচন কমিশন আচরণবিধিসহ প্রয়োজনীয় সব বিধি প্রণয়ন করতে পারে এবং সেসব বিধি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো কর্তৃক অনুসারিত হচ্ছে কি না, তা তদারকি করার অধিকারী। সে সঙ্গে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও কার্ড প্রদান থেকে শুরু করে সীমানা নির্ধারণসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। অর্থাৎ এ দেশের নির্বাচন কমিশন কাঠামোগতভাবে স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। তবে এ প্রতিষ্ঠানের সবলতা বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিকায়নে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি কোনো আইন প্রণীত হয়নি। সাম্প্রতিক কালে বাছাই কমিটি করা হলেও নিয়োগপ্রক্রিয়া অনেকাংশে রাজনৈতিক বিবেচনায় সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন নিজ বিশাল কর্মযজ্ঞে পরনির্ভরশীল। এর প্রকৃত অর্থবল ও লোকবল নেই। ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা থেকে শুরু করে ভোটকেন্দ্রে রিটার্নিং নির্বাচনী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, নিরাপত্তা রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের নির্বাহী বিভাগের দ্বারস্থ হতে হয়, যাদের জবাবদিহি এ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাবহির্ভূত। নির্বাচনী বাজেটসহ অর্থ বরাদ্দ এবং লজিস্টিকসের জন্য সরকারি সহায়তা প্রকট।

জাহান মন্তব্য করেন যে বাংলাদেশে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলো কখনোই সন্তোষজনকভাবে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী ক্রীড়ার রেফারি হিসেবে

প্রাতিষ্ঠানিকায়নে ভূমিকা রাখেনি। কমিশন বরাবর সরকারি সাহায্য এবং বাজেট সহায়তার জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকেছে। সরকারগুলো পরম্পরায় হয় তাদের সমর্থকদের কমিশন হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছে অথবা স্বাধীন মতাবলম্বী কমিশনারদের ওপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা এবং এর কর্মপরিকল্পনার সংস্কৃতি গণতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থান করেছে।[১১]

লক্ষণীয় যে আইনি কাঠামোতে নির্বাচন কমিশনকে প্রভূত কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে এ প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। তবে উপরিউক্ত কারণে নির্বাহীর চাপ বা প্রভাবমুক্ত হয়ে কমিশনকে সাধারণভাবে দৃঢ় প্রত্যয়ী বা কমিশনারদের নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যমে আচরণগতভাবে বলিষ্ঠতা প্রদর্শন লক্ষ করা যায়নি। এ দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাধীনে কমিশনের তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা নির্মিত হলেও এ ব্যবস্থাটি নিজস্ব সীমাবদ্ধতায় ক্রমান্বয়ে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিল হলে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সমঝোতার সংকট তৈরি হয়। এ দেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলোতে সহিংসতা, মনোনয়ন ও প্রচারণায় অর্থের প্রভাব, পেশিশক্তি প্রদর্শন, নির্বাচনী আচরণবিধি ও গণপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশের প্রায়ই লঙ্ঘন ও বিভিন্ন অনিয়ম লক্ষণীয় হয়েছে, যা কমিশনের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। হোসাইন উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের জন্য প্রকৃত চ্যালেঞ্জ সাংবিধানিক বা আইনি বিষয় নয়, বরং তা বহুলাংশে রাজনৈতিক বিষয়।[১২] এ দেশে যথারীতি নিয়মমাফিক বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের শর্তাবলি যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ার সংকট গণতন্ত্র নির্মাণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। গণতন্ত্র চর্চায় বহুমাত্রিক সমস্যা বিরাজমান থাকায় নির্বাচন প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সমঝোতার মাধ্যমে কার্যকর করা সম্ভবপর হয়নি। সর্বসম্মত নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শর্তাবলির অভাব গণতন্ত্র নির্মাণের সহায়ক শক্তিগুলোর ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন জটিলতর এবং বাধাগ্রস্ত করেছে।

সংসদ

মুক্ত এবং অবাধ নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। তবে গণতন্ত্রকে সমাজের গভীরে প্রোথিত এবং সুষ্ঠুভাবে চর্চার জন্য অন্যান্য মুখ্য প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করাও অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বিশেষত আইনসভার মাধ্যমে নির্বাচনগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক ও মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে আইন পরিষদ তথা জাতীয় সংসদ। গবেষকগণ উল্লেখ করেন

যে শক্তিশালী আইন পরিষদ মজবুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচায়ক। এ পরিষদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণতন্ত্রে এ প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। সংসদ হচ্ছে সেই প্রাতিষ্ঠানিক একক, যার মাধ্যমে নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের দৈনন্দিন প্রতিনিধিত্ব এবং দাবিদাওয়ার প্রকাশ অনুধাবন করতে পারে।[১৩]

সংসদের সদস্যরা নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং সরকারের নির্বাহী ও বিচার বিভাগের তুলনায় অধিকতর এবং ব্যাপক স্বার্থের ও অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এটি সরকারের সবচেয়ে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ এবং প্রকাশিত প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামো ও উপকাঠামোর মধ্যে এ শাখার কর্মসম্পাদন জনঘনিষ্ঠ এবং দৃশ্যমান বা প্রকাশিত। আইন পরিষদের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ ছাড়াও আইন প্রণয়নই প্রধানতম দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে সরকার ও নির্বাহী কাজকর্মের বৈধকরণ করা হয়। এ জন্য নির্বাহীকে সংসদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের আস্থাভাজন হতে হয়। জননীতিতে সমর্থন বা সমালোচনার মাধ্যমে সংসদ জনমতের প্রতিফলন ঘটায় এবং নির্বাচনী রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। সংসদ-সমর্থিত বা অনুমোদিত বাজেট এবং অর্থ বরাদ্দের ওপর সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম ও পরিচালন নির্ভরশীল। সমাজ ও সময়ের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল সংবিধানের পরিমার্জন বা সংশোধন সংসদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সংসদীয় সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন সম্ভবপর হয়। সংসদের প্লেনারি এবং কমিটি অধিবেশনের কর্মকাণ্ডে সরকারি ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন, বিতর্ক ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিকতা পায় এবং সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তবিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে।

নির্বাহীর কাজের সুষ্ঠুতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদের তদারকি ভূমিকাটি গণতন্ত্রে অতীব গুরুত্ববাহী। এ তদারকি বা ওভারসাইট কাজ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি উভয়ই নির্দেশ করে। সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাহীর ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি রয়েছে। রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতন্ত্রেও সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয় হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় ওভারসাইট কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রধান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একক কৌশল হিসেবে রয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব, তর্ক ও বক্তব্যদান, মুলতবি প্রস্তাব, জনগুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অর্ধঘণ্টা আলোচনা ও পিটিশন এবং যৌথ কৌশল হিসেবে রয়েছে সংসদের কমিটি ব্যবস্থা। সংসদে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের বিদ্যমান সমস্যা ও জটিল বিষয়ের ওপর যুক্তিপ্রদান ও প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাখ্যা দান করা হয়। চলমান বিশ্বে জীবনধারা জটিলতর হচ্ছে এবং সরকারি কাজের বিস্তৃতি ঘটে চলেছে। এ

প্রেক্ষাপটে সংসদ জনগণের পথপ্রদর্শক এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। নেলসন পলসবি আইন পরিষদকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্নায়ু বা নার্ভের সঙ্গে তুলনা করেন।[১৪]

জনগণের দাবিকে নীতিতে রূপদানসহ সংসদ নির্বাহীকে তথ্য প্রদানে বাধ্য করতে সক্ষম হয়। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে সংসদীয় ক্রিয়াকলাপ বহুমাত্রিক যেমন প্রতিনিধিত্ব, বক্তব্য প্রদান, স্বার্থ জ্ঞাপন ও সংরক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, নেতৃত্ব নির্মাণ, সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, নির্বাহীর বৈধতা দান, অর্থসংক্রান্ত কাজ, সামাজিকীকরণ, নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা দাবি, নীতির বিশ্লেষণ স্বচ্ছতা-আনয়ন, তদারকি ও কর্তৃত্বে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, জনদাবির প্রকাশ ঘটানো, শিক্ষাদান ও সমাজের গতিশীলতা রক্ষণ।

সংসদের স্বর্ণালি যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যের প্রেক্ষাপটে 'সংসদীয় সার্বভৌমত্বের' ধারণা গড়ে ওঠে এবং নির্বাহীকে সংসদের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। সংসদীয় অনাস্থায় সরকারের বিভিন্ন সময় পতন ঘটে। কারণ, সে সময়ে দলীয় শৃঙ্খলা এ সময়ের মতো সুদৃঢ় ছিল না। সাংসদের নিজস্ব গুণাবলিসমৃদ্ধ সংস্কৃতির তুলনায় বর্তমানের দলীয় সংহতি, আনুগত্য ও নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত। এভাবে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এবং জনজীবনের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠায় সে দৃষ্টিকোণ থেকেই সংসদীয় আচরণ গড়ে উঠেছে। দলীয় কঠোর শৃঙ্খলা এবং প্রভাব বর্তমানের সংসদ ও সংসদীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নির্বাহী এবং আইন পরিষদের মধ্যে অসম সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে নির্বাহীর প্রাধান্য এবং কর্তৃত্ব বিস্তার অব্যাহত আছে। সরকার ও নির্বাহী কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতিসহ আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ সংসদের ওপর অব্যাহত চাপ সৃষ্টিসহ সংসদকে নির্বাহীর 'রাবার স্ট্যাম্প'সুলভ ব্যবহার দৃশ্যমান হয়, যা সংসদের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে রাখছে।

আইন পরিষদের ক্ষেত্রে ওপরে বর্ণিত প্রবণতা এবং ক্ষমতা হ্রাসের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও সংসদের অভ্যন্তরীণ আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অপরিবর্তিত রয়েছে এবং আইন প্রণয়নকে একটি বিশেষায়িত পদ্ধতি বলা যায়, যা নির্বাহী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিল প্রক্রিয়ায় নির্বাহীর জোর অংশ থাকলেও এ প্রক্রিয়াকে পুরোপুরিভাবে নিজ অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে লক্ষ করা যায় না। বিশেষভাবে বিলের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পর্যায়, তর্ক-বিতর্ক, সমালোচনা, কমিটি ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন দান, ভোট গ্রহণ ও অনুমোদন ইত্যাদি কার্যক্রম অদ্যাবধি নির্বাহীর ওপর চাপ সৃষ্টিতে সক্ষম। সংসদকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কাঠামোর সমষ্টি বলা হয়। যেমন সংসদের একটি বা দুটি কক্ষ, সরকার ও বিরোধী দলের মুখোমুখি আসনবিন্যাস, সংসদীয় দলসমূহের অভ্যন্তরীণ

ও আন্তসম্পর্ক, স্পিকার, কমিটিসমূহের প্রধান, হুইপগণের অবস্থান ও পারস্পরিক ভূমিকা পালন ইত্যাদি সংসদীয় কর্মকাণ্ডের প্রভাবক। এ ছাড়া মিডিয়া, সুশীল সমাজ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, থিংক ট্যাংক, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমেও এ কর্মকাণ্ড প্রভাবিত হয়ে থাকে। অদ্যাবধি আইন পরিষদ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং সংসদের ওপর নির্বাহী এবং জনগণের উভয়েরই নির্ভরশীলতা রয়েছে। সরকারের নিজস্ব স্থিতি ও আইন প্রণয়ন এবং কর অনুমোদনের জন্য সংসদীয় সার্টিফিকেট প্রয়োজন। অপর দিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার এবং সমাজ পরিবর্তনে আবশ্যক মৌলিক আইন এবং সংশোধনের প্রণেতা হচ্ছে সংসদ। দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী পক্ষ সংসদ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করে নিজেদের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়াস পায়। এভাবে সংসদ জনগণের কণ্ঠ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়। সংসদের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়ন করতে পারে। তবে সংসদই সাংবিধানিকভাবে নির্বাহীর দৈনন্দিন তৎপরতার আনুষ্ঠানিক তদারকি করে। সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাহী এবং সংসদের সম্পূর্ণ পৃথক্করণ বা পৃথক অবস্থানের সুযোগ নেই, যদিও এ দুইয়ের নিজস্ব কর্মপরিধি বা সীমারেখা রয়েছে।

গণতন্ত্রের এক অনন্য শর্ত হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী সংসদীয় দলগুলোর মধ্যকার আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা। এর প্রকাশ ঘটে সংসদের কাঠামো ও ক্রিয়াশীলতায়। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রায়ণের মাধ্যমে সুশাসন অর্জনে ও দায়িত্বশীল নির্বাহী প্রতিষ্ঠায় সংসদের কার্যকরী ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির চরম বিকাশের ফলে ই-সরকারব্যবস্থা ই-সংসদ চালু এবং এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, অনলাইনের মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা প্রদান, খসড়া বিল প্রক্রিয়ায় জনমত সংগ্রহ ও অনুভূতি প্রকাশ সম্ভব করে তোলা হচ্ছে। নতুন এ পরিস্থিতি গভর্ন্যান্সের সার্বিক প্রক্রিয়ায় সংসদকে গুরুত্ববাহী করে তুলছে এবং এর প্রাতিষ্ঠানিকায়ন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। ক্যামিনো উল্লেখ করেন যে 'Legislative institutionalization implies both an internal dimension and external dimension, each of which touches upon different legislative-building elements that solidify over time,'[১৫] বস্তুত, অভ্যন্তরীণ বিভাজন দ্বারা স্বকীয়তা এবং বিশেষায়িতকরণ নিয়ামক হয় এবং সংসদীয় কাঠামোসমূহ ক্রমান্বয়ে স্থিতিশীলতা, স্থায়িত্ব, সুনির্দিষ্টতা, দক্ষতাসহ সংসদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে এ দেশের আইন পরিষদ, অর্থাৎ জাতীয় সংসদ। সংবিধানের পঞ্চমভাগে ৬৩

থেকে ৯৩ নম্বর অনুচ্ছেদে সংসদ, আইন প্রণয়ন, অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বিধান রয়েছে। ৭৬(১) অনুচ্ছেদে সরকারি হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠনের নির্দেশ আছে। এ প্রতিষ্ঠান করারোপ, সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সংসদীয় তদারকি, নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা দাবি, নির্বাচন ও অপসারণ, সংবিধান সংশোধন, নির্বাহীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনসহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের অধিকারী। সংসদের কার্যক্রম পরিচালনের জন্য ১৯৭৪ সালে সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি প্রণয়ন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত এবং এর কার্যপ্রণালি আদালতে চ্যালেঞ্জ না করার বিধান রয়েছে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। (ক) সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা, যার মর্মার্থ হলো সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা। এটি সংসদের স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করেছে। তা ছাড়া সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সাংসদ নির্বাচিত হলে যদি তিনি ওই দল থেকে পদত্যাগ করেন বা সংসদে ওই দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন বা কোনো জোট গঠন করেন, তবে তাঁর সংসদীয় আসন শূন্য বলে গণ্য করা হবে এবং তিনি সদস্যপদ হারাবেন। (খ) রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ কঠোর দলীয় শৃঙ্খলার উপস্থিতি। ফলে সংসদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, গুণাবলি বা দক্ষতার চেয়ে দলীয় আনুগত্য ও নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দল অপরিহার্য হওয়ায় সংসদীয় আচরণ ওই আদলে নির্মিত হয়েছে এবং দলীয় প্রভাবই সংসদীয় রাজনীতির মূল নিয়ন্ত্রক বা নির্ধারক। এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বন্দ্বমূলক ও সংকীর্ণ হওয়ায় আন্তদলীয় সম্পর্ক সংঘাতময় হয়েছে এবং তারা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। (গ) আচরণগত সীমাবদ্ধতা বা সংসদ সদস্যদের অনেকের বিশেষত নবাগতদের সংসদীয় দক্ষতার অভাব এবং এর নেতিবাচক প্রভাব। তা ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা ও রাজনীতির সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ায় সংসদীয় কর্মকাণ্ডে পেশাদারত্ব নেই। সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদের অনেকের অনভিজ্ঞতা ও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে নারী প্রান্তিকতা লক্ষণীয়।[১৬]

বাংলাদেশ জন্মলাভের পর থেকে অদ্যাবধি দশটি জাতীয় সংসদ গঠন করা হয়েছে। তবে রীতিসিদ্ধ দায়িত্ব পালনে প্রতিটি সংসদ উল্লেখিত সমস্যা ও অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার আবর্তে থেকেছে। তবে সংসদীয় মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সংসদীয় কাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যার মধ্যে রয়েছে কাঠামোগত সংস্কার, কার্যপ্রণালি বিধি প্রণয়ন, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠন, টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীদের কমিটির সদস্য বা প্রধান হিসেবে না থাকার বিধান, জাতীয় সংসদ সচিবালয় স্থাপন, উত্থাপিত

বিলসমূহ আবশ্যিকভাবে যথাযথ কমিটিতে প্রেরণ, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু, মন্ত্রী নন এমন সাংসদদের কমিটির প্রধান নির্বাচিতকরণ, সংসদের দুটি অধিবেশনের মধ্যকার সময়সীমা ৬০ দিনে হ্রাসকরণ, নারী প্রতিনিধিদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করে পঞ্চাশে উন্নীতকরণ, সংসদীয় বিভিন্ন ককাস গঠন, সংসদ-টেলিভিশন চালু এবং ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ। ইতিবাচক এসব পদক্ষেপ সংসদীয় কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হলেও তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দূরত্ব থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাবলি লক্ষণীয় হয়, যা সুষ্ঠু সংসদীয় রাজনীতি চর্চায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বমূলক সংস্কৃতি ও অসহনশীলতা বিরাজমান থাকার কারণে সংসদের কাঠামোতে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী বেঞ্চের কর্মকাণ্ডে 'এনিমি ডিসকোর্স' প্রভাবক হয়। উভয় পক্ষের অসহিষ্ণুতায় বিভিন্ন সময় অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বিতর্কের ফলে সংসদীয় কর্মঘণ্টার অপচয় হয়। সুষ্ঠু সংসদীয় তদারকি এবং নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা দাবি যথাযথভাবে পালন করা সমস্যাসংকুল হয়।

এ দেশের জাতীয় সংসদগুলোতে আইন প্রণয়নের হার সংসদপ্রতি গড়ে শতাধিক। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ অনুমোদন, সামরিক শাসকদের জারিকৃত সব বিধিবিধান ও কার্যক্রমের বৈধতা দান ও সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী অন্যতম। অনেক ক্ষেত্রে বিল প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত পর্যায়গুলো বিশেষত ব্যাপক, আলোচনা ও বিতর্ক, কমিটি কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় ইটপুটসহ প্রতিবেদন এবং ভোট প্রদান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রেজারি বেঞ্চের বিল প্রক্রিয়ায় ক্ষিপ্রতাও দৃশ্যমান হয়েছে। অনুমোদিত বিলের সবই সরকারি। বেসরকারি বিলের পাসের হার খুবই স্বল্প।

বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় 'ফিউশন অব পাওয়ার' বা ক্ষমতার মিশ্ররূপ এবং সরকারের দুটি অঙ্গ সংসদ এবং নির্বাহীর ঘনিষ্ঠতা সাংবিধানিকভাবে রয়েছে এবং একই ফ্লোরে অবস্থান করে সাংসদবর্গ ওভারসাইট বা তদারকি কর্মকাণ্ড চালান। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। গবেষণায় লক্ষ করা যায় যে সাংসদদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও এলাকাভিত্তিক নীতি সুবিধা আদায় এবং এ-সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রাধান্য পায়। ক্ষমতাসীন দলের প্রশাসনিক দায় বা ব্যর্থতাসংবলিত মুলতবি প্রস্তাব গ্রাহ্য না করার প্রবণতাসহ কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সার্বিকভাবে কমিটি কার্যক্রম ও এর অনুসন্ধানমূলক কর্মকাণ্ড বেগবান হতে পারেনি।

এ দেশের সংসদীয় কর্মকাণ্ডে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্টের মধ্যে রয়েছে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াকআউট এবং সংসদ বয়কট, কোরাম সংকট, অনির্ধারিত রাজনৈতিক বিতর্ক, বিরোধী দলের কথা না বলতে দেওয়ার অভিযোগ, স্পিকারদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ, কমিটির অনিয়মিত সভা ইত্যাদি প্রধান।

ইতিমধ্যে সংসদের দুটি অধিবেশনের দূরত্ব ৬০ দিন হওয়া সত্ত্বেও বার্ষিক গড় বৈঠক ৭৫ দিন ও দিনপ্রতি গড় বৈঠক মাত্র ৩ ঘণ্টার কিছু বেশি। এটি যুক্তরাজ্যে বার্ষিক ১৪৬ দিন ও দৈনিক ৮ ঘণ্টা এবং ভারতে যথাক্রমে ১০০ দিন এবং ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা। বাংলাদেশে সংসদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশি আসনে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের সংখ্যা হ্রাস এবং নারী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং এথনিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব প্রান্তিক পর্যায়ের। ফলে ব্যাপক ও জনগোষ্ঠীর প্রকৃত দাবিদাওয়া ও চাহিদার প্রকাশ সংসদে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। সংসদীয় ককাসগুলোর ফলপ্রসূতাও লক্ষণীয় নয়। এ দেশে সংবিধানের ১২তম সংশোধনীর মারফত সংসদীয় কাঠামো পুনরায় চালু হয়। তবে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ের রাষ্ট্রপতি শাসনের 'রুল অব বিজনেস'-এর প্রতিস্থাপন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে, যা সংসদ ও নির্বাহীর অসম ক্ষমতা সম্পর্কের পরিচায়ক। তা ছাড়া সংসদীয় কর্তৃত্বকে সীমিত রাখার ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে কঠোর দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চার জন্য ক্রিয়াশীল সংসদ অপরিহার্য। এ দেশের জাতীয় সংসদ নিজস্ব পরিসরে কর্তৃত্বপূর্ণ, তবে ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন নেতিবাচক উপাদানের কারণে এর মূল কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব এবং তদারকির দায়িত্ব পালনে রীতিসিদ্ধ সক্ষমতা লক্ষণীয় হয়নি। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংসদের সামগ্রিক অর্জন মিশ্র প্রকৃতির। সংসদীয় প্রাতিষ্ঠানিকায়নের জন্য এর দীর্ঘ স্থায়িত্ব, স্বাধীনতা, নিয়মসিদ্ধ শ্রমবিভাজন ও সর্বজনীনতার আবশ্যিক উপাদানগুলো এ দেশের সংসদ তত্ত্বগতভাবে ধারণ করলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সীমাদ্ধতা থাকায় জাতীয় সংসদের প্রাতিষ্ঠানিকতা সমস্যাসংকুল হয়েছে।

রাজনৈতিক দল

গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন ও নির্মাণের জন্য আবশ্যক কর্মসম্পাদন নির্ভর করে সুষ্ঠু দল ব্যবস্থার ওপর। বস্তুত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট দলসমূহের কার্যকরী ভূমিকা পালন অপরিহার্য। এর কারণ হলো, রাজনৈতিক দলই জনপ্রিয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে এবং সংসদ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন কাঠামোয় সংশ্লিষ্ট হয়ে দায়িত্ব পালন করে। গণতন্ত্র বিনির্মাণ, কাঠামোগত দায়িত্বশীলতা ও অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্ধারক হচ্ছে রাজনৈতিক দল এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইনপুট ও আউটপুট কার্যাবলির অন্যতম প্রভাবক। কাজেই দক্ষ, গতিশীল ও কর্ম-উদ্দীপনাপূর্ণ সক্রিয় রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকায়নকে সমাজবিজ্ঞানীরা

বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। রাজনৈতিক দলসমূহের সর্বত্র বিচরণশীলতার কারণে তাঁদের কর্মকাণ্ড জনজীবনকে প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তনের বাহক হিসেবে তারা সমাজের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে অর্পিত কর্মসম্পাদন করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দলের ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন, সরকার ও বিরোধী দলে যথাযথ নিজ নিজ অবস্থান এবং দল ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়ন দলসমূহকে সাংগঠনিক পর্যায় থেকে উন্নীত করে প্রাতিষ্ঠানিকায়নের শিখরে নিয়ে যেতে পারে। অতএব, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দল গঠন ব্যাস্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে সুষ্ঠু শাসনপ্রক্রিয়া নির্দেশ করে। কেননা যে ব্যবস্থাধীনে দল নিজ কর্মকাণ্ড চালায়, সে ব্যবস্থার প্রতি দলের জবাবদিহি এবং জনগণের কাছে দায়িত্ব পালন বর্তায়। এসব প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় গণতন্ত্র চর্চা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন করে এবং অংশগ্রহণমূলক অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অবদান রাখে। উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক দলের এহেন দায়িত্বশীল ভূমিকা সম্ভব হয়েছে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নের প্রক্রিয়ায়। এ পটভূমিকায় রাজনীতি চর্চার নিয়মনীতির ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য, রাজনৈতিক প্রথা ও পদ্ধতির অনুসরণ, আইনসংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং প্রাসঙ্গিক বিধিবিধান বিশেষ ক্রিয়াশীল থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেইনওয়ারিং উল্লেখ করেন যে দলীয় ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকায়নের জন্য চারটি উপাদান আবশ্যক। যেমন আন্তদলীয় প্রতিযোগিতার নিয়ম ও পদ্ধতির স্থিতিলাভ, সমাজের গভীরে দলসমূহের শক্ত/মজবুত অবস্থান, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বৈধতা এবং সুসংহত, শৃঙ্খলাসমৃদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত রাজনৈতিক দলসমূহের উপস্থিতি।[১৭] লক্ষ করা গেছে যে পশ্চিমা উন্নত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ সাংগঠনিক স্থায়িত্ব, তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত স্থিতিশীল সাংগঠনিক কাঠামো, প্রত্যয়ী নেতৃবৃন্দ এবং নিজ নিজ প্রার্থীদের অনুকূলে জনগণের আস্থাপ্রত্যাশী এবং একই সঙ্গে নিজেদের উপযোগী, সুষ্ঠু বিকাশ এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।[১৮] অপর দিকে উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এরূপ দলীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না এবং গণতন্ত্র নির্মাণ এবং সুষ্ঠু দলীয় ব্যবস্থা কায়েমে বহুমাত্রিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিরাজমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর সংসদীয় কাঠামোয় বহু দলীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়, যা তৎকালীন পাকিস্তানের অকার্যকর দলীয় ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি রোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তবে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ও প্রক্রিয়া নেতিবাচক ভূমিকা রাখে, যার মধ্যে রয়েছে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন; রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ এবং দলীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা; রাজনৈতিক অভিলাষে সেনানায়কদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চালু এবং দলসমূহে ব্যাপক মাত্রায় উপদলীয় কোন্দল বা ফ্যাকশনালিজম, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ববাদী শাসন; সামরিক

বাহিনী-সমর্থিত কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বাবধায়ক শাসন; অনুদার শাসন কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি।

একানব্বই-পরবর্তী সময়ে এ দেশে প্রধান দুটি দলের নেতৃত্বে একধরনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা লক্ষণীয় হয়। তবে এ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং প্রধানত দ্বন্দ্বমূলক পারস্পরিক সম্পর্ক লালন করা। রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মতৈক্য না থাকায় এ সম্পর্ক পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং দলব্যবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়নি।

এ দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সংবিধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ দলের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, স্তরসমূহের কর্মপরিধি, দলীয় নেতৃত্বসহ সব স্তরে নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এসব বিধি ও নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরিত হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে 'টপ-ডাউন অ্যাপ্রোচ' স্থানীয় উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশকে উৎসাহিত করেনি। ফলে স্থানীয় গতিশীল ও উদ্যমী কর্মীদের দলের ওপরের সারিতে উঠে আসায় স্থবিরতা রয়েছে। বড় দলগুলোর দলীয় কাউন্সিল ও কনভেশন অনিয়মিত হয়েছে এবং শীর্ষ কাঠামো অনুসৃত নির্দেশাবলি প্রাধান্য পেয়েছে। এভাবে দলীয় কাঠামোয় রক্তসম্পর্কীয় যোগসূত্র এবং আরোপিত মনোনয়ন শক্তিশালী হয়। এ দেশে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত সমস্যা রয়েছে। রাজনৈতিক দলে সুযোগসন্ধানীদের অনুপ্রবেশ লক্ষণীয় হয় এবং তাদের অর্থ ও পেশিশক্তির কারণে প্রধান দলগুলোতে অন্তঃপ্রবেশের পথ সৃষ্টি করে। তারা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ ও সমর্থকদের জন্য তা বিতরণে সক্ষম হয়। দলীয় কাঠামোবহির্ভূত নেতিবাচক উপাদান রাজনৈতিক প্রতিকূলতা জন্ম দেয় এবং মূল্যবোধনির্ভর রাজনীতি ধারণ করে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা দুরূহ হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে যোগ্যপ্রার্থী সমন্বয়ে সুষ্ঠু মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোয় লক্ষণীয় হয়নি এবং এ জন্য যথার্থ প্রার্থিতা উপেক্ষিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এভাবে সাম্প্রতিক সময়ের সব জাতীয় সংসদে নব্য ধনিকগোষ্ঠী এক বড় অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক সংগঠনের এহেন মনোনয়ন প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। দলীয় মূল সাংগঠনিক কাঠামোয় নারীর অবস্থান প্রান্তিক এবং এ দেশের প্রধান দুটি দল নারী নেতৃত্বাধীন হলেও নারীদের দলগত প্রভাব নেই। পিতৃতান্ত্রিক আদর্শে নির্মিত রাজনীতিতে সীমিত সুযোগ থাকার কারণে রাজনৈতিক সংগঠনে নারী নেতৃত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত এবং নারীর প্রান্তিকতা রয়েছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের নিজস্ব তহবিল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে স্পষ্টতা নেই। এ ক্ষেত্রে যথাযথ স্বচ্ছতা না থাকায় যেকোনো উৎস থেকে অর্থ

সংগ্রহ করে তহবিল গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনী প্রচারণার অর্থ জোগান দেওয়ার ব্যাপারে অনৈতিকতার অভিযোগ ওঠানো হয়েছে। আন্তদলীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির কারণে নির্বাচনী প্রচারণায় ধার্যকৃত ব্যয়ের সীমা প্রায়ই ভঙ্গ হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়া অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এভাবে রাজনীতি খুব ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে ওঠে। এ দেশের দল ব্যবস্থায় প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট উপাদানটি অসম সম্পর্ক নির্দেশ করে, যা রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাকে বিনষ্ট করে। রাজনৈতিক দলগুলোকে স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকের সমর্থন আদায়ে ব্রতী হতে লক্ষ করা গেছে এবং তার সমর্থক বাহিনীকে নিজ সংগঠনের আওতাভুক্ত করে কার্যক্রম ও প্রচারণা চালায়, যা দলের আদর্শচ্যুতির কারণ ঘটায় এবং নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করে। অনেক সময় মক্কেলদের আনুগত্য নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষকের পক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা দলমুখী না হওয়ায় রাজনৈতিক দলে পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক বাহিনীর আন্তবিরোধ ও কলহ প্রকট হওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। দল গঠন ও নির্বাচনী রাজনীতিতে পৃষ্ঠপোষকতার উপাদান দুর্বল আনুগত্য, কোন্দল, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় এবং দলের প্রাতিষ্ঠানিকায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি দেশে হরতালের সংস্কৃতি দুর্বল হলেও বিরোধী পক্ষের সন্ত্রাস সৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

ইতিমধ্যে গণপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হলো রাজনৈতিক দলসমূহের দায়িত্বশীলতা নির্মাণ ও গণতান্ত্রিক আচরণ নিশ্চিত করা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের আবশ্যিক নিবন্ধন, দলীয় সংবিধান ও নেতৃত্ব নির্বাচন গণতন্ত্রসম্মত হওয়া, দলের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ পদ নারীদের জন্য নির্ধারণসহ ২০২০ সালের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জন, প্রার্থী মনোনয়নে স্থানীয় মতামতের গুরুত্ব প্রদান, দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের সীমারেখা টানা, দলীয় অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং যথাসময়ে কমিশনের কাছে দলীয় আয়-ব্যয়ের বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব দাখিলকরণ। তবে লক্ষণীয় হয়েছে যে এসব বিধিবিধান খণ্ডিত উপায়ে দলগুলো অনুসরণ করেছে। তথ্য প্রকাশসহ আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিরূপণও যথাযথ নয়।

তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশ গণতন্ত্র বহুত্ববাদ ও বহুদলীয় ব্যবস্থা ধারণ করে চর্চার প্রয়াসে রয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব ও চর্চার ক্ষেত্রে ফারাক থাকায় দলীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠু হতে পারছে না এবং দলসমূহের যৌক্তিক সংগঠনে রূপান্তরিত হতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জাহান তাঁর গবেষণায় প্রধান দলগুলোর যেসব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন তা হচ্ছে : কেন্দ্রীভূত এবং বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব; পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ কার্যক্রম, কাঠামোগত সংস্কারের খণ্ডিত বাস্তবায়ন, উলম্ব এবং সমান্তরাল জবাবদিহির অনুপস্থিতি, কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া, সামাজিক বিভিন্নতার অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব, আন্ত ও অন্তর্দলীয়

কোন্দল এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রণে কোন্দল ও সহিংসতার বিস্তার।[১৯]

উপসংহার

গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলেও বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা জনমানসে এবং মূল্যবোধে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। বস্তুত, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছাড়া গণতন্ত্র নির্মাণ কখনোই সম্ভবপর হয় না। রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রাখা জরুরি। কারণ সর্বাত্মক বা কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা বিভিন্নধর্মী স্বার্থের বা মতামতের তোয়াক্কা করে না। কাজেই বৈধতার ভিত্তিত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন এবং কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস সর্বময় ক্ষমতাকে সীমার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহের যথাযথ ভূমিকা পালন ও গণতান্ত্রিকতার প্রতিভূ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আরও প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ, যার প্রকাশ প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ এবং জনগণের প্রতি সাড়াদানমূলক কর্মকাণ্ড পালনের মাধ্যমে ঘটে। মতামত ও স্বার্থের বহুত্ববাদিতা এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। গণতন্ত্র তাই ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলোর কার্যকরী শক্তি অর্জনের ওপর নির্ভরশীল।

গণতন্ত্র চর্চা অনেকাংশে নির্ভর করে কীভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিন্যাসকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মধ্যে এবং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্র, আদান-প্রদান এবং কর্মযোগ নির্মাণ করে তার ওপর। গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থানকে নির্ভরশীল এবং অনির্ভরশীল উভয় চলক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন নির্বাচন, সংসদ এবং রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র চর্চার অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে অবস্থান করে এবং গণতান্ত্রিক কর্মযোগ ঘটায়। বলা বাহুল্য যে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকায়ন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নেরই নামান্তর। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠান যত বেশি শক্তিশালী হয়, সেখানে গণতন্ত্র তত বেশি কার্যকর।

বাংলাদেশের প্রসঙ্গে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্ব, উপযোগিতা, সুষ্ঠু বিকাশ, পারস্পরিক ভারসাম্য, জবাবদিহি এবং যথার্থ ক্ষমতা-সম্পর্ক নির্ণয় এ প্রবন্ধে বর্ণিত বিভিন্ন কারণে সমস্যাসংকুল হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে মতৈক্যের ভিত্তিতে সর্বগ্রাহ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র বিনির্মাণ বাধাগ্রস্ত হয়।

তথ্যসূত্র

১. Matthew Flinders, *Defending Politics why democracy matters in the twenty first century*, Oxford: Oxford University Press, 2012, p.1)

২. Is Democracy in Decline? Remarks to the club of Madrid Meeting, Florence, Nov., 14, 2014 by Larry Diamond.

৩. Fredrik Engelstad, 'Social Institutions in Modern Democracy', *Institute of Social Research*, Oslo, 16.4.2017.
৪. SP Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven, Yale Univ. Press, 1968, p. 12.
৫. B. Guy Peters, 'Institutional Theory: Problems and Prospects', 69 Political Science Series, July 2000, Institute of Advanced Studies, Vienna.
৬. Sisson R. 'Comparative Legislative Institutionalization: A Theoretical Exploration' in Kornberg. A (Ed) *Legislature in Comparative Perspectives* pp. (17-37), NY: David Mc key Co. Inc. 1974.
৭. Johan P. Olsen, 'Change and Continuity: an institutional approach to institutions of democratic government,' *European Political Science Review* (2009) 1:1. 3-32. p. 9.
৮. Carl Dancun, 1993, *Organizing Free and Fair Elections at Cost-Effective Level*, London: Commonwealth Secretariat.
৯. Electoral System Design: The New International IDEA Hand Book, 2005.
১০. মো. আব্দুল আলীম, 'নির্বাচন পরিচালনা প্রক্রিয়া : প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা' আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত *বাংলাদেশে নির্বাচন* ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮।
১১. R. Jahan, 'The Challenges of Institutionalizing Democracy in Bangladesh,' ISAS Working Payer, No. 39, March, 2008, p.19.
১২. নাসিম আখতার হোসাইন, 'নির্বাচনী গণতন্ত্রে নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ : প্রাতিষ্ঠানিক নাকি রাজনৈতিক' *বাংলাদেশে নির্বাচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
১৩. Joel D. Barkan, 'Legislative Development in Africa,' in Democratization in Africa. What Progress Towards Institutionalization,? NIC Conference Report, Feb. 2008, pp. 15-28.
১৪. Nelson W. Polsby, 'Legislatures', in *Handbook of Political Science: Government Institutions and Processes*, Greenstien and Polsby (eds.) Reading MA: Addision, Weslcy, 1975.
১৫. ইভান মরিসিও ওবান্ডো ক্যামিনো, 'Legislative Institutionalization' Historical Origins and Analytical Framework (mimeo).
১৬. Nizam Ahmed, *The Parliament of Bangladesh*, Ashgate, 2002.
১৭. Mainwaring et. al. *Building Democratic Institutions: Party System in Latin America*, Cambridge University Press, 1995, p. 5-6.
১৮. SP Huntington, *Political Order in Changing Societies*: New Haven: Yale Univ., Press, 1968, p. 12.
১৯. Rounaq Jahan, *Political Parties in Bangladesh Challenges of Democratization*, Dhaka: Prothoma Prokashas, 2015.

কোন পথে বাংলাদেশ

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা কোন দিকে? স্বাধীন হওয়ার সাতচল্লিশ বছর পার হলেও জনমানসে এ বিষয়ে সংশয় কাটেনি। ১৯৭২ সালে মনে করা হয়েছিল ধর্মীয় পরিচয়নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি এবং সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হবে। ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বরূপটি উপরিউক্ত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুক্তিযুদ্ধের ধারণার আলোকে আজও কেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে গড়ে তোলা সম্ভব হলো না? ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে এর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার বর্তমান রূপ এবং তার সঙ্গে ইসলাম পন্থার রাজনীতির আন্তসম্পর্ক ও উন্নয়নের বিষয়টির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বহুত্ববাদ, কর্তৃত্ববাদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রকাঠামো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ।

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি উদার গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা থেকে বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের[১] জন্ম হয়। বহুত্ববাদের চিন্তাধারা থেকে রাষ্ট্র নির্মাণের কল্পনা ছিল এমন যে রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষক যেমন হবে না, তেমনি কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্বাধীন ধর্মচর্চায় বাঁধাও সৃষ্টি করবে না। এ আকাঙ্ক্ষা থেকেই রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত হবে না বলে ধারণা করা হয়েছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্র যদি পাকিস্তানের মতো ধর্মীয় পরিচয় ধারণ করে, তাহলে তা গণতন্ত্রের অন্যতম মূল প্রপঞ্চ হিসেবে যে

অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। ফলে, পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের অন্তর্গত সব ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র হিসেবে তা গড়ে উঠবে না। ধর্মীয় পরিচয়কে বাদ দিয়ে যে নতুন রাষ্ট্রটি গড়ে উঠবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, সেখানে ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতির হয় চির অবসান ঘটবে অথবা প্রান্তীয় অবস্থানে চলে যাবে বলে অনেকে মনে করেছিলেন। এ রকম বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও উন্নত হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্র একই সঙ্গে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে।

একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠার পর সাতচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে আকাঙ্ক্ষাগুলো সামনে রেখে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছিল, সেগুলো এত বছর পর এসে কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, তার মূল্যায়ন করা। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী পক্ষগুলোর তিনটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। এগুলো হলো বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করা এবং ন্যূনতম সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। আজকের বাংলাদেশে এই আকাঙ্ক্ষাগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বহুত্ববাদী গণতন্ত্র এবং প্রাসঙ্গিক তত্ত্বীয় কাঠামো

বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহুত্ববাদের ধারণাকে বাদ দিয়ে একটি রাষ্ট্র নিজেকে গণতান্ত্রিক দাবি করতে পারে না। মাইকেল ওয়ালজারের (২০০৭) ভাষ্য অনুসরণ করে বলা যায়, বিভিন্ন ধর্মীয় মত, নানা বর্ণ ও জাতিসত্তার নারী-পুরুষ যখন একটি ভূখণ্ডে সম-অধিকার এবং স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তখন তাকে বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায়।[২] বহুত্ববাদের ধারণার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টা যুক্ত। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রকে বহুত্ববাদী হতে হলে তাকে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, অন্তর্ভুক্তি বলতে আমরা কী বুঝি? রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলোর পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত হবেন কারা?

তত্ত্বগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র বলতে বোঝায় প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো বিষয়ে কথা বলার বা মত দেওয়ার অধিকার সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত হওয়া এবং নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নাগরিকদের মতামত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রে নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিকেরা ভূমিকা পালন করতে পারে। তত্ত্বগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র হলো এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে জাতি, বর্ণ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস ব্যতিরেকে প্রত্যেক

নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনার যেকোনো বিষয় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারে। এ রকম রাষ্ট্রে বিভিন্ন কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিনিধি নির্বাচন বা নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে। নাগরিকদের রাষ্ট্র পরিচালনাপ্রক্রিয়ায় নানাভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যকার যে সামাজিক চুক্তির কল্পনা করা হয়, তা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[৩]

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদের একটা সংকীর্ণ ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে এ যুক্তিতে যে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদের ধারণাকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এ ধারণা বাস্তবায়নে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য হলো মাত্রার দিক থেকে। অর্থাৎ কোনো কোনো রাষ্ট্রে এ ধারণা বাস্তবায়নের হার অনেক বেশি, আবার অনেক রাষ্ট্রে এর হার অনেক কম। সাধারণত দেখা যায়, যেসব রাষ্ট্র উদার গণতান্ত্রিক নীতি দ্বারা পরিচালিত এবং ধর্ম রাষ্ট্রীয় ও ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক পরিকাঠামো থেকে বিযুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে চর্চিত হয়, সেসব রাষ্ট্র অধিক পরিমাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডের কথা। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এ রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী মনে করা হয়। কারণ, এখানে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নীতি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে চর্চার চেয়ে ধর্ম অনেকটা ব্যক্তিগত বিষয়ের অন্তর্গত থাকে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নীতির ফলে নাগরিকদের নানা বিষয়ে মত প্রকাশের আপেক্ষিক স্বাধীনতা অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় এ তিনটি রাষ্ট্রে বেশি রয়েছে। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং জাতিগত পরিচয় নিরিখে নাগরিকেরা নীতিনির্ধারণের বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কম বাধাহীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে। রাষ্ট্র তার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিসত্তা বা ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে নাগরিকদের বক্তব্যকে অন্য অনেক রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর আমলে নেয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের বিপরীতে আরেক ধরনের রাষ্ট্র দেখা যায়। এদের কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র বলা যায়। হুয়ান লিঞ্জ (Juan Linz) কর্তৃত্ববাদের চারটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা বোঝার জন্য তার মধ্য থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ।[৪] লিঞ্জের মতে, এ ধরনের রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের চর্চার সুবিধা সীমিত এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন সংসদ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সরকার কর্তৃক সব সময় একধরনের চাপের মধ্যে থাকে। এর বাইরে বিচার বিভাগ ও সিভিল সমাজকেও ক্ষমতাসীনদের চাপের মধ্যে থাকতে হয়। তবে লিঞ্জ এই ব্যাপারটি উল্লেখ করেননি। তিনি কর্তৃত্ববাদের দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন,

তা হলো এ ধরনের শাসনে সরকারের বৈধতার উৎস হয় আবেগ বা ইমোশন এবং শাসন বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে সহজেই চোখে দেখা যায় এমন সব সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। যেমন অনুন্নয়ন বা সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন।

কর্তৃত্ববাদী শাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের উপস্থিতি। এখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা খুবই সীমিত এবং সরকার সাংবিধানিক দায়িত্বশীলতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না (শেকিগুচি, ২০১০ :৯২)। কর্তৃত্ববাদের নানা রূপ, যেমন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামরিক শাসন, একদলীয় শাসন এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর শাসন ইত্যাদি থাকলেও তাদের যে বিষয়ে মিল দেখা যায় তা হলো, তারা সবাই কোনো না কোনো জনগোষ্ঠীকে শাসনব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত রাখতে চায়। এ ধরনের রাষ্ট্রে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের নিরিখে জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রকাঠামো পরিচালনাপ্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইরানে সুন্নি ও ইহুদি, সৌদি আরবে শিয়া এবং গণচীনে যারা ক্ষমতাসীন দলের নীতির সঙ্গে একমত নয়, তাদের এসব রাষ্ট্র পরিচালনপ্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয় এবং সরকার মতামত প্রকাশে নানাভাবে বাধা দেয়। এসব রাষ্ট্রে সব নাগরিক স্বাধীন এবং সম-অধিকারের ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক অধিকার চর্চা করতে পারে না। এর ফলে সব নাগরিক সমান অধিকারও ভোগ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকিস্তানে অমুসলিমদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ নেই। ইরানে নারীদের এবং শিয়া ছাড়া অন্য ধর্মীয় বিশ্বাসের কারও পক্ষে দেশটির সর্বোচ্চ পদগুলোয় আসীন হওয়ার অধিকার সাংবিধানিকভাবেই নেই।

কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ধর্মের দ্বিবিধ সম্পর্ক দেখা যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ধর্মের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিযুক্তকরণ—দুই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এক্সক্লুসিভ, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চীন ও সৌদি আরবের কথা। চীন ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত করেছে। আর সৌদি আরব ধর্মকে করেছে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুই দেশই এর মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে আলাদা করা অত্যাবশ্যকীয় হলেও এর মানে বহুত্ববাদী উদারনৈতিক ব্যবস্থা নয়।[৫]

উপরিউক্ত দুই ধরনের রাষ্ট্রের বাইরে আরেক ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখা যায় যেখানে বহুত্ববাদ ও কর্তৃত্ববাদের বা গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের উপাদানগুলো একই সঙ্গে দেখা যায়। এ ধরনের ব্যবস্থাকে ল্যারি ডায়মন্ড (২০০২) হাইব্রিড রেজিম বা সংকর বা মিশ্র শাসনব্যবস্থা বলেছেন। রেজিম প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারের চেয়ে বেশি স্থায়ী ধরনের রাজনৈতিক

ব্যবস্থাকে বোঝানোর জন্য (ফিশ ম্যান ১৯৯০)।[৬]

উল্লিখিত প্রতিটি শাসনব্যবস্থার সমর্থকেরাই মনে করেন যে একমাত্র তাঁদের শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এক অর্থে তাঁদের সবার কথাই ঠিক। কারণ, প্রতিটি শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মানব ও সামাজিক উন্নয়নও তিন ধরনের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। তবে দেখা যায়, যেসব কর্তৃত্ববাদী ও হাইব্রিড রেজিম ইসলাম ধর্মকে ক্ষমতা বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, সেসব রাষ্ট্রে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক এবং সেক্যুলার দাবিদার কর্তৃত্ববাদী ও হাইব্রিড রেজিমের নারীদের তুলনায় কম। এ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন—যেকোনো শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। তবে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের সঙ্গে বাকি দুই শাসনব্যবস্থার পার্থক্য হলো, কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের ভূমিকা পালন করার কোনো সুযোগ নেই এবং হাইব্রিড রেজিমে এ অধিকার সীমিত। কিন্তু বহুত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় জনগণের মতামতকে উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় তুলনামূলক বিচারে অধিক আমলে নেওয়া হয়। বহুত্ববাদী শাসন হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক। অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার তুলনামূলক বেশি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে হাইব্রিড রেজিমে এ অধিকার সীমিত হলেও কর্তৃত্ববাদে এ অধিকার অত্যন্ত সীমিত।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের বর্তমান শাসনকাঠামোর স্বরূপ, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক এবং এর গতিপ্রকৃতি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থা ইতিহাস বিচ্ছিন্ন, বিমূর্ত কোনো বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিকতার ফল। তাই বর্তমান গতিপ্রকৃতির চিত্র ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অবিভক্ত পাকিস্তান : ধর্মভিত্তিক কর্তৃত্ববাদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জমান 'বাংলাদেশ বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন (মনিরুজ্জামান, ১৯৮০)। এ বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা। বস্তুত, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে শুরু থেকে মূল সংকটটা ছিল গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব। জন্মলগ্ন থেকেই অবিভক্ত পাকিস্তানে বহুত্ববাদের অনুপস্থিতি দেখা গেছে। এর পুরো সময়টাই একধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসন লক্ষ করা গেছে, যার বহিঃপ্রকাশ হলো একটানা দীর্ঘ সময়

সামরিক একনায়কের অধীনে দেশ শাসন। এ ধরনের শাসনের মূল লক্ষ্যই থাকে বেশিসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বিযুক্ত করে মুষ্টিমেয় কিছু এলিটের শাসন বজায় রাখা।[৭] পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে এই এলিটরা মূলত ছিলেন অবাঙালি সামরিক ও বেসামরিক আমলা। এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলারা তৎকালীন দ্বিমেরু বিশ্বে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি খুবই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বলতেন, পাকিস্তান এখনো বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠেনি। একই সঙ্গে সব সময় ইসলামকে নানাভাবে রাজনীতিতে ব্যবহার করলেও তাঁদের প্রায় সবারই ব্যক্তিগত জীবনধারা ছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-অনুকরণজাত।

পাকিস্তানের আমলা শাসকগোষ্ঠী দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। আর তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোকে ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে রাখা এবং বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রান্তে রাখা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের (ইসলাম ধর্মের অনুসারী না হওয়ার কারণে) দর্শনগতভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির বাইরে অবস্থিত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিতই হয়েছিল একটি এক্সক্লুসিভ রাষ্ট্র হিসেবে, যার মূল লক্ষ্য ছিল ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রকাঠামোর পরিচালনপ্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত করে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক এলিটদের শাসনকে নিশ্চিত করা। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইসলাম ধর্মকে। পাকিস্তানের শাসকশ্রেণিটি ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে না দেখে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদীর চিন্তার আলোকে একে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবেও বিবেচনা করেছে এবং ব্যবহার করেছে। উদ্দেশ্য ছিল একে তাদের শাসন বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা।[৮]

কর্তৃত্ববাদী শাসনের কারণে বাঙালি রাজনৈতিক এলিটরা যখন মনে করলেন তাঁরা কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে গণতান্ত্রিক পন্থায় তাঁদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারবেন না, তখনই তাঁরা পাকিস্তানি জাতিসত্তার বিপরীতে জাতিসত্তার আরেকটি ভিন্ন রূপকল্প দাঁড় করান। এর ভিত্তিতে তাঁরা একটি নতুন রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে চাইলেন। পাকিস্তানি জাতিসত্তার বিপরীতে তাঁরা সামনে নিয়ে আসেন বাঙালি জাতিসত্তার ধারণাকে। একে কেন্দ্র করে নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য গড়ে তোলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ যাদের বিযুক্ত করেছে, অর্থাৎ হিন্দুসহ অমুসলিম জনগোষ্ঠী, বাঙালি জাতীয়তাবাদ সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত

বাংলাভাষী সব ধর্মের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু ভাষা ও জাতিভিত্তিক এ প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে যায় অবাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীরা। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত কোনো জাতীয়তাবাদী প্রকল্পই একটি ভূখণ্ডের অন্তর্গত সব জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে গড়ে ওঠেনি। তত্ত্বগতভাবেই জাতীয়তাবাদের ধারণা একটি এক্সক্লুসিভ প্রকল্প, যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শুধু একটি জাতিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

পাকিস্তানি জাতিসত্তার মূল ভিত্তি ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। এ জাতিসত্তার প্রবক্তারা হিন্দু ও মুসলমানদের দুটি পৃথক জাতি হিসেবে ভেবেছিলেন। তাঁরা জাতি ও জাতিরাষ্ট্র-সংক্রান্ত সাবেকি চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন ছিলেন। ভেবেছিলেন যেহেতু হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি, ফলে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে এক রাষ্ট্রে বাস করা সম্ভব নয়। জাতিরাষ্ট্র-সংক্রান্ত ধারণাতে শুধু একটি জাতি এবং সে জাতিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একটি জাতিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদকে একটি রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। এ ধরনের চিন্তা অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রে শুধু একটি জাতির পক্ষেই বাস করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে এমন কোনো রাষ্ট্র পাওয়া মুশকিল, যেখানে শুধু একটি জাতির মানুষই বাস করে। ফলে জাতিরাষ্ট্রতত্ত্বের সমর্থক উপনিবেশবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের নেতারা এর সমাধান হিসেবে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মানুষকে সে রাষ্ট্রে বাস করতে হলে বৃহৎ জাতির পরিচয়ে পরিচিত হয়ে নিজ জাতিসত্তার পরিচয়কে হয় বিলুপ্ত অথবা তার অধীন করে নিতে বলেন। এক জাতি, এক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণার ওপর গড়ে ওঠা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামও এ সংকটের বাইরে ছিল না। বাঙালি জাতিকেন্দ্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় কী হবে, এ প্রশ্ন যখন দেখা দেয়, তখন এক জাতি, এক রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ পরিচয় উপেক্ষা করে বাঙালি জাতির পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার কথা বলা হয়।

অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রায় পুরো সময়টা ছিল কর্তৃত্ববাদী, একনায়কতান্ত্রিক শাসন, যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল ইসলাম ধর্ম। কর্তৃত্ববাদী শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল কোনোভাবেই যাতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহুত্ববাদ স্থান করে নিতে না পারে। এর বিপরীতে 'বাংলাদেশ বিপ্লব'কে সংগঠিত করা হয় বহুত্ববাদী গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথক্করণের চিন্তাকে মাথায় রেখে। ফলে বাংলাদেশ বিপ্লব একটি ঐক্যবদ্ধ প্রকল্প না হলেও আপামর জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের মধ্যে এ ধারণা জন্মেছিল যে আর কিছু না হোক, স্বাধীন দেশটি পাকিস্তানি ধারণার, অর্থাৎ ধর্মকেন্দ্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের দর্শন, অর্থাৎ বহুত্ববাদী গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হতে ধর্মের বিযুক্তকরণের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।[৯] বস্তুত এ দুটি বিষয়ই জনগোষ্ঠীর যে অংশটি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের একধরনের মানসিক পীড়নের মধ্যে ফেলে দেয়।

স্বাধীন বাংলাদেশ : কর্তৃত্ববাদের কালপর্ব

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি গঠিত হওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফেলে আসা ভাবধারার পুনরুত্থান ঘটে; অর্থাৎ অবিভক্ত পাকিস্তানের আদলে রাষ্ট্রকাঠামো পরিচালনা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। নতুন সরকার যেসব সামরিক-বেসামরিক বাঙালি আমলা ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, তাদের সবাইকে নতুন রাষ্ট্রকাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন একাডেমিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ অংশটি শুরু থেকেই পাকিস্তানি ভাবধারার শাসন, অর্থাৎ আমলা নেতৃত্বে কর্তৃত্ববাদ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ইসলামের অনুপস্থিতির বিষয়টি না থাকার ফলে একধরনের অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে। পাশাপাশি বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় আইনি ও গোপন বিভিন্ন বাম দল, যাদের প্রভাব তৎকালীন তুলনামূলকভাবে অধিক ছিল, তাদের সবারই লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল করে গণচীন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদলে একদলীয় সর্বাত্মকবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা। এর বাইরে সে সময়ে নিষিদ্ধঘোষিত ইসলাম পন্থার দাবিদার দলগুলো ধর্মভিত্তিক কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিল।[১০] ফলে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও সর্বাত্মকবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সে সময় পরিলক্ষিত হয়। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর যে বিষয়টি ঘটে সেটি হলো, বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা ধারণকারী বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক এলিটদের প্রধান দল তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সিপিবি, ন্যাপকে (মো) সঙ্গে নিয়ে দল বিলুপ্ত করে বাকশাল গঠন। এর ফলে সোভিয়েত আদলে একদলীয় সর্বাত্মকবাদী শাসনের সূচনা ঘটে।

বাকশাল গঠনের কিছু সময় পরই ধারাবাহিক অভ্যুত্থান এবং পাল্টা-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক আমলারা ক্ষমতা দখল করে দেশকে একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য সরাসরি সামরিক শাসনের ধারায় নিয়ে যান। বস্তুত এ সময়টাতেই হামজা আলাভি উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বাস্তবতায় যেটাকে বলেছেন অতি বর্ধিত রাষ্ট্র, সে অতি বর্ধনের বিষয়টা ঘটে। আলাভি মনে করেন, উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল থাকার ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার শক্তিশালী আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে (আলভি, ১৯৭২)। বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর স্বল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্রটির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে এসেছিল, যা কিনা পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকেও সামান্য সময়ের জন্য ছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যে সামরিক আমলারা রাষ্ট্রকাঠামোর দখল নিয়ে নেন। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় স্বাধীন বাংলাদেশে। পাকিস্তান আমলে বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করা হলেও সেখানে

রক্তপাতের বিষয়টা ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশে রাষ্ট্রকাঠামোয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব মিলিটারি এলিটদের এতটাই অধৈর্য করে তোলেন যে তাঁরা যেকোনো পন্থায় তা আমলাদের দখলে ফিরিয়ে আনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। এর অনিবার্য পরিণতি হলো রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনীতিবিদদের হাত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের দখল নেওয়া। এখানে উল্লেখ্য, যেসব সামরিক-বেসামরিক এলিট বাংলাদেশ বিপ্লবের সমর্থনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বা সমর্থন দিয়েছিলেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদে তাঁদের একটা বড় অংশই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আমলাদের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা দেখার মানসিকতা ধারণ করত। নতুন রাষ্ট্র গঠিত হলে পাকিস্তানি জ্যেষ্ঠ আমলাদের মতো একই ভূমিকা তাঁরা পালন করতে পারবেন বলে তাঁদের অনেকে মনে করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন দেশে পুরো রাষ্ট্রীয় কাঠামো রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে চলে গেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার অল্প সময় পরই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষনির্বিশেষে একশ্রেণির সামরিক-বেসামরিক আমলা সুযোগ খুঁজছিলেন আমলাতন্ত্রের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে পাকিস্তানি আমলাদের মতো রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে।

যে নিয়ন্ত্রণটি ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে রাজনীতিবিদেরা অতি বর্ধিত রাষ্ট্রের কাছে হারিয়েছিলেন, সেটা তাঁরা আর কখনোই পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারেননি। রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের একটা প্রভাব সব সময়ই থেকে গেছে, শুধু এর মাত্রাটার হেরফের হয়েছে, অর্থাৎ কখনো কম, কখনোবা বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে বা পারছে। বর্তমানে যে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কথা নানা সময়ে বলা হয়, এ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারার অন্যতম কারণও হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আমলাতন্ত্রের অতিমাত্রার প্রভাব।

সামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আসার পর পাকিস্তান আমলের মতোই তারা তাদের সহযোগী হিসেবে বেসামরিক আমলাদের পায়। বেসামরিক আমলাদের এ ক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠী হিসেবে সামরিক আমলাদের হুকুমত মেনে চলা ছাড়া ভিন্ন কোনো অবকাশও ছিল না। লাতিন আমেরিকার সামরিক শাসনের সময়ও আমরা একই চিত্র দেখি। রাজনৈতিক বা সামরিক—যে নেতৃত্বই ক্ষমতায় থাক, বেসামরিক আমলারা মূলত তাদেরই অনুগামী থাকেন। তবে রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে নেতৃত্বে অদক্ষতা দেখা দিলে সে সময় রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বিষয়ে আমলাদের অধিক ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি হয়।

ক্ষমতাসীন সামরিক আমলারা জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি গুণগত সংযোজন আনেন, যা এখনো বাংলাদেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। এ দুটি সংযোজন আবার

পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও পরিপূরক। এর প্রথমটি হলো পাকিস্তানি ধারায় সংবিধানের ধর্মীয় চরিত্র দেওয়া। পরবর্তী সময়ে আরেক সামরিক শাসক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আরেক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিরই একটি ধর্মীয় রূপ দেন। তিনি সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী এনে রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ত, ভাষা ও জাতিসত্তাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ভূখণ্ডভিত্তিক জাতিসত্তার একটি নতুন ধারণা দাঁড় করিয়ে আরেকটি সমান্তরাল জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা, যাকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। আপাতদৃষ্টে প্রত্যয়গতভাবে একে অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয়তাবাদ মনে হলেও সংবিধানের ধর্মীয় চরিত্রদান এবং ইসলামভিত্তিক রাজনীতির পুনর্বাসন, পৃষ্ঠপোষণ এবং বিকাশের পরিবেশ তৈরি করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ দ্বারা মূলত মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতিরই পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়। এই জাতীয়তাবাদ অমুসলিমদের তার প্রকল্পে ধারণ করতে পারেনি। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলো যেখানে এক জাতি এবং তার জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেখানে জাতিসত্তার পুনর্নির্মাণ এবং ধর্মীয় বাতাবরণে আরেকটি জাতীয়তাবাদী প্রকল্প গড়ে তোলার ফলে বাংলাদেশ পৃথিবীতে এমন একটি ইউনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেখানে একটি রাষ্ট্রে দুটি জাতি এবং জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি দ্বান্দ্বিক অবস্থান দেখা যায়। যেসব রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পেরেছে, সে রকম কোনো রাষ্ট্রেই সমান্তরাল জাতীয়তাবাদের দ্বান্দ্বিক অবস্থান দেখা যায় না। বাংলাদেশে যেসব কারণে আজও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি, তার অন্যতম আরেকটি মূল কারণ হচ্ছে এ দুটি বিপরীতমুখী জাতীয়তাবাদের দ্বান্দ্বিক, সমান্তরাল অবস্থান।

১৯৭৫-৯০ কালপর্বে বেসামরিক আমলাদের সহায়তায় সামরিক আমলাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। অবশ্য এ সময়কালে ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে দল গঠন, নির্বাচন ইত্যাদি নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সব সময় একটা ক্যামোফ্লাজ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে রাষ্ট্র বেসামরিক নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে বা রাষ্ট্রযন্ত্র রাজনীতিবিদদেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ কালপর্বে অনেক সামরিক-বেসামরিক আমলার রাজনীতিবিদ হওয়ার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। কর্তৃত্ববাদ বলতে আমরা যা বুঝি, এ কালপর্ব মূলত ছিল তা-ই; অর্থাৎ সামরিক একনায়কের অধীনে কর্তৃত্ববাদ। সামরিক কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা এ কালপর্বে নিজেদের আড়াল রাখতে চেয়েছেন গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে। তাই তাঁদের যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে দল (বিএনপি, জাতীয় পার্টি) গঠন করে নিজেদের সেসব দলের নেতা বনে যেতে দেখা গেছে, তেমনি অন্য দলগুলোকে নানামুখী চাপের মধ্যে রেখে রাজনীতি করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

সেসব নির্বাচনে বিরোধী দল যে বিজয়ী হয়ে আসতে পারবে না, তা সরকারি, বিরোধী সব দলের সমর্থকেরা যেমন জানতেন, তেমনি সাধারণ জনগণও তা মনে করত এবং বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। এর পাশাপাশি গণমাধ্যমের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়, যেটার দুঃখজনকভাবে সূচনা হয়েছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক রাজনৈতিক এলিটদের দ্বারা চারটি ছাড়া সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। সামরিক একনায়কদের কর্তৃত্ববাদী শাসনের সময় সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাও সে-তুংয়ের গণচীন বা উত্তর কোরিয়ার মতো অতটা কঠোর ছিল না, যেখানে সরকারবিরোধী মতের কোনো স্থানই ছিল না।

১৯৭৫-৯০ কালপর্বটিতেই প্রচলিত ভাষায় যাকে বলা হয় 'ধর্মীয় মৌলবাদ', যা কিনা স্বাধীন বাংলাদেশে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না বলে মনে করা হয়েছিল, সে মৌলবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজে পুনর্বাসিত হয়, যা পরবর্তী কালপর্বে আরও ব্যাপক পরিসরে বিকশিত হয়ে ওঠে। 'ধর্মীয় মৌলবাদের' রাজনীতি বাঙালি জাতীয়বাদী এবং বামপন্থার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেবে, এ ধারণা থেকে ক্ষমতাসীন সামরিক একনায়কেরা সেই মৌলবাদের রাজনীতির প্রসারকে উৎসাহিত করেছিলেন। সে সময় পাশ্চাত্যের উদার, গণতান্ত্রিক সেক্যুলার দেশগুলো মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে বামপন্থার রাজনীতি ঠেকানোর মাধ্যম হিসেবে ইসলাম পন্থার রাজনীতিকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি গ্রহণ করে, যার ফলে সেসব দেশের কর্তৃত্ববাদী শাসকদের সে একই পন্থা গ্রহণ করতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। সে সময় অবশ্য এটা ধারণা করা হয়নি যে ইসলাম পন্থার রাজনীতি একসময় বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। সে সময় এ ধারণা ছিল, ইসলাম পন্থার রাজনীতি শুধু স্বৈরশাসকদের ক্ষমতায় টিকে থাকার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এ ছাড়া সামরিক-বেসামরিক আমলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্তানি আমলের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করত, জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে ন্যূনতম হলেও ইসলামের পরিচয় যুক্ত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রে ইসলাম পন্থার রাজনীতির একটি শক্তিশালী অবস্থান থাকা উচিত। রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামিক ভাবধারা টিকিয়ে রাখার জন্যই এটা প্রয়োজন। তত্ত্বগতভাবে তাদের এ অবস্থানও ইসলাম পন্থার রাজনীতি বিকাশের পরিবেশ তৈরি করতে উৎসাহিত করে।

এককথায় সামরিক কর্তৃত্ববাদী শাসনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখি, সেগুলো হলো বিরোধী দল ও মতকে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে সব সময় একধরনের চাপের মধ্যে রাখা, গণমাধ্যমগুলোর ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রকাঠামো ব্যবহার করে সামরিক এলিট-সমর্থিত সরকারি দলের (এ ক্ষেত্রে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি) জয়লাভ,

কোনো অবস্থাতেই বিরোধী দল যাতে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসতে না পারে, আমলাদের সহায়তায় তা নিশ্চিত করা, ইসলাম পন্থার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা, প্রসার এবং বিকাশের পরিবেশ তৈরি করা। এ ছাড়া সংবিধান ও রাষ্ট্রের ধর্মীয় চরিত্র দেওয়া, যার ফলে অমুসলিম সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে একধরনের মানসিক বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্মলাভ করে। সামরিক কর্তৃত্ববাদ-উত্তর গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে শুরু হয়, তা এসব লিনিয়েজকে ধারণ করেই যাত্রা শুরু করে। তবে দুঃখজনক হলো, জনগণ সামরিক শাসনোত্তর সময়কালে ক্ষমতাসীন দলগুলো থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পরিবর্তে নানা রূপে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সেই কর্তৃত্ববাদী শাসনের ভূতকেই যেন বারবার দেখতে পায়।

সামরিক শাসন-পরবর্তী কাল : বহুত্ববাদী গণতন্ত্র?

১৯৯০ সালে সামরিক শাসক এরশাদের পতনের পর সামরিক শাসনোত্তর পরিবেশে শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়। এতে মনে করা হয়েছিল অন্তত এরপর থেকে নিয়মিত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন প্রথম অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে আরেক সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসে। তারা ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা এবং এর ধারণা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলেও ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে যে দুবার তারা জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় ছিল, সেই দুবারই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচন করতে চেয়েছে এবং দুবারই তারা ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। প্রথমবার ১৯৯৬ সালে একতরফা নির্বাচন করার পর আওয়ামী লীগ, সামরিক শাসক এরশাদের জাতীয় পার্টি, জামায়াত এবং বামপন্থী দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে যে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে, তাতে বেসামরিক আমলারা প্রত্যক্ষ সমর্থন দেওয়ার ফলে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পতন ঘটে। অতীত থেকে শিক্ষা না নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পাশ কাটিয়ে দলীয় রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ঘোষণা করে। তখন সামরিক আমলাদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে ২০০৭ সালে বিএনপি-সমর্থিত সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পতন ঘটে, যা কিনা ইতিহাসে এক-এগারোর ঘটনা হিসেবে পরিচিত। সংবিধান অনুযায়ী, নিয়ম মেনে একমাত্র আওয়ামী লীগই একবার ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল এবং সে সরকারের অধীনে নির্বাচন করে তাতে পরাজিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে বাতিল করে ২০১৪ সালে দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন দেয়। বিএনপিসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সে নির্বাচন বর্জন করেছিল। কিন্তু পেট্রলবোমা-নির্ভর সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এমন এক কালপর্বে ২০০৯ সালে আবার ক্ষমতায় আসীন হয়, যে সময়টাকে অনেকটাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম পন্থার রাজনীতির স্বর্ণযুগ বলা যায়। বিএনপি শাসনকালে, বিশেষ করে ২০০১-০৬ কালপর্বে নিয়মতান্ত্রিক ইসলাম পন্থার রাজনীতি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং সন্ত্রাসবাদী ধারার ইসলাম পন্থার রাজনীতির বিকাশ ঘটে। ইসলাম পন্থাজাত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিস্তার এবং একটা ইসলামি জনপরিমণ্ডল তৈরি হয়।[১০] নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পাশাপাশি ইসলামিক স্টেট নামে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ঢেউ আসে বাংলাদেশেও। সামরিক শাসকদের মতোই চিন্তা করা হয় যে ইসলাম পন্থার রাজনীতি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং হয়েছেও তাই। ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সব হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল আওয়ামী লীগ, বাম ও সেক্যুলাররা।

পাশ্চাত্যের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নীতির ফলে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও ইসলাম পন্থার রাজনীতির দ্বন্দ্বই বর্তমান বিশ্বরাজনীতির মূল নিয়ামক। পাশ্চাত্যও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম পন্থার তুলনামূলকভাবে সহজ ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকুক, সেটাই যেন চাইছিল। বাংলাদেশেও এ চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন সিভিল সমাজে বাম এবং সেক্যুলার হিসেবে পরিচিত এমন অনেকেই। ফলে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ইসলাম পন্থার রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করে, তখন পাশ্চাত্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সিভিল সমাজের এ অংশটিও নানা ফোরামে সরকারের নীতির তীব্র বিরোধিতা করে। ইসলাম পন্থার রাজনীতিকে যেকোনোভাবে বাঁচিয়ে রাখার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সম্মিলিতভাবে পাশ্চাত্যের মাঝে দেখা গিয়েছিল, যা থেকে তাদের কেউ কেউ এখনো পুরো বেরিয়ে আসেনি। তারই সুরে এ দেশের সিভিল সমাজে বাম ও সেক্যুলার পরিচিত অনেকেই দাবি তোলেন ইসলাম পন্থার রাজনীতিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্পেস দিতে। এর পেছনে তাঁরা এখনো যে যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন তা হলো, এতে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি ঠেকানো যাবে।

কিন্তু বিশ্বরাজনীতিতে ইসলাম পন্থার সঙ্গে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক শক্তির সংঘাতের ধারণা বদলে যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ফলে। প্রথমটি হলো, পরাশক্তি

হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে রাশিয়ার ফিরে আসা এবং ইসলাম পন্থার নামে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নেওয়া। দ্বিতীয়টি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া। ট্রাম্প নির্বাচিত হয়ে আসার পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে রাশিয়া ও গণচীনকে প্রধান প্রতিপক্ষ ধরে সমরনীতিতে পরিবর্তন আনেন এবং বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কম মাথা ঘামানোর নীতি নেন। এর ফলে বিশ্বরাজনীতিতে ইসলাম পন্থার রাজনীতি অনেকটা গুরুত্ব হারিয়ে কোণঠাসা অবস্থানে চলে আসে, যা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ সরকারকে সুবিধা দেয়।

আওয়ামী লীগ আইনি ও বেআইনি দুই ধরনের ইসলাম পন্থার রাজনীতিকে কঠিন হাতে দমনের পথ ধরে। ফলে এ দুই ধারার রাজনীতিই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রান্তে চলে যায়। কিছু সময় আগেও যেখানে মনে করা হতো, ইসলামভিত্তিক সন্ত্রাসবাদ হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠছে, সেখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তন ও আওয়ামী লীগ সরকারের পদক্ষেপের ফলে সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এটি সম্ভব হয়েছে সিভিল সমাজের একাংশ এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম পন্থার রাজনীতিকে স্পেস দেওয়ার প্রেসক্রিপশন অনুসরণ না করেই। বরং এ প্রেসক্রিপশনের বিপরীতে গিয়ে নানা আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে ইসলাম পন্থার রাজনীতির মূলধারা জামায়াতে ইসলামীকে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হয়ে আসার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে অবশ্য আওয়ামী লীগ সখ্য বৃদ্ধি করেছে হেফাজতের মতো সংগঠনের একটা অংশের সঙ্গে, যারা মূলত প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করছে। এরা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরাসরি অংশগ্রহণের চেয়ে সমাজে ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রসারে অধিক আগ্রহী। এ ছাড়া তুলনামূলকভাবে দুর্বল বা কম জনভিত্তিসম্পন্ন দলগুলো, যাদের আলী রীয়াজ ও খন্দকার রাজী (২০১১) 'মাজারপন্থী' ইসলামভিত্তিক দল বলে অভিহিত করেছেন, তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ একটা দীর্ঘ সময় ধরে সুসম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। এ কথা বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলা যায়, আওয়ামী লীগ যদি তার শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলোয় মাজারপন্থী ইসলামভিত্তিক দলগুলোর নামেমাত্র কিছু প্রতিনিধি ছাড়া ইসলাম পন্থার দলগুলোর ভূমিকা পালন করার কোনো সুযোগ থাকবে না। তবে হেফাজতের মতো রক্ষণশীল ধারাগুলোর একটা চাপ কমবেশি আরও দীর্ঘ সময় যারাই ক্ষমতাসীন থাকবে, তাদের মোকাবিলা করতে হবে।

ইসলাম পন্থার দলগুলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলোয় স্থান করে নেওয়ার পথ কঠিন করে তুললেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামসহ সংবিধানের ধর্মীয় চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখার ফলে অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে তত্ত্বগতভাবে হলেও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রান্তে রাখার যে

ধারণা, সেটিকে বলবৎ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রটি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠেনি। এ ছাড়া স্বয়ং রাষ্ট্রব্যবস্থারই একটি মৌলিক পরিবর্তন গত দশ বছরে সাধিত হয়েছে, যেটা আগে কখনো দেখা যায়নি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির হামজা আলাভির অতি বর্ধিত রাষ্ট্র থেকে 'গভীর রাষ্ট্রে' রূপান্তর ঘটেছে, যার মূল বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক দল, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং মিডিয়ার নিজেদের মাঝে একটি অলিখিত বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা। গভীর রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা শুধু রাজনৈতিক দলের ইচ্ছা বা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিচালিত হয় না। গভীর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার বিষয়টি শুধু যে বিকশিত অর্থনীতিতে, যেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, সেসব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, এমনটি নয়। এটি বিকশিত অর্থনীতি এবং প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রযোজ্য বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১২]

গভীর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হলেও এ সময়কালে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যেমন বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি বিস্তার লাভ করেছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর। সেগুলোর ওপর কখনো কখনো একধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রবণতা যেমন দেখা গেছে, তেমনি একই সঙ্গে সিভিল সমাজ এবং রাজনীতিকসহ নানা অ্যাক্টিভিস্টের বাক্‌স্বাধীনতা চর্চা করার ক্ষেত্র আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক বিস্তৃত হয়েছে। তবে একই সঙ্গে কখনো কখনো প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্বতঃপ্রণোদিত সেন্সরশিপের বিষয়টিও রয়েছে। কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়া স্বতঃপ্রণোদিত সেন্সরশিপের কথা বললে হঠাৎ মনে হতে পারে, এটা বোধ হয় শুধু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোরই বিষয়। পাশ্চাত্যের তুলনামূলক বিচারে বিকশিত গণতন্ত্রে বোধ হয় এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পাশ্চাত্যেও রাষ্ট্রযন্ত্র ও করপোরেট মিডিয়ার স্বার্থ একই জায়গায় মিলে যাওয়ায় সেখানেও প্রায় ক্ষেত্রেই ভিন্ন চিন্তার ব্যক্তিদের মিডিয়ায় আসার বা লেখা প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত মার্কিন ভাষা তত্ত্ববিদ ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ নোয়াম চমস্কির কথা বলা যায়। উন্নয়নশীল বিশ্বে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও তাঁর চিন্তাধারা মার্কিন এস্টাব্লিশমেন্টের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে কথা বলার জন্য তাঁকে সাধারণত মূলধারার ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ডাকা হয় না এবং জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলোতে তাঁর লেখা ছাপা হয় না। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই রয়েছে।

তবে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় যে দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে সেটি হলো দুই ধারার জাতীয়তাবাদের বাঙালি ও বাংলাদেশির মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়টি। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের জন্মের পর থেকেই এ দুই ধারার যে যখনই ক্ষমতায়

গিয়েছে, তখনই চেষ্টা করেছে অপর ধারাকে আইনি, বেআইনি নানা উপায়ে চাপে রাখার। কখনো কখনো এক ধারা অপর ধারাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে, মনোজগতে দুই পক্ষের মধ্যে এ চিন্তাধারা এখনো বিরাজমান। দুই পক্ষই মনে করে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করে সামনে এগোতে হলে অপর পক্ষকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। বস্তুত এ মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব একে অপরের মাঝে যে বিশ্বাসহীনতার জন্ম দিয়েছে, তা এ দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। ফলে আওয়ামী লীগ যখন তত্ত্বাবধায়ক সকারের ধারণা বাতিল করে দেয় এ যুক্তিতে যে অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকার কোনো সাংবিধানিক সুযোগ নেই, তখন বিএনপির কাছে এটি প্রতীয়মান হয় আওয়ামী লীগের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতায় থাকার কৌশল হিসেবে। তবে এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে রাষ্ট্রকাঠামোকে গভীর রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের অঙ্গীকারকেও জোরালোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

আর এ প্রশ্নবিদ্ধতার কারণেই গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নয়নের প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে জোর দিতে দেখা যাচ্ছে, যা কিনা সাধারণত কর্তৃত্ববাদী শাসকেরাই করে থাকেন। অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকার বৈধতার মাধ্যম হিসেবে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়ে আসার চেয়ে উন্নয়ন সংগঠন করার বিষয়টা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। সন্দেহ নেই, গত দশ বছরে মাথাপিছু আয়সহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, সামাজিক বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক উন্নতি এবং বিদ্যুৎ-সহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি এ প্রশ্নটিও থেকে যাচ্ছে যে দশ বছর আগে আওয়ামী লীগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে কি না। এ না পারার মূল কারণটি হচ্ছে পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের যে ব্যাপক দুর্নীতির উত্তরাধিকার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার পায়, সেটি কার্যকর মাত্রায় দূর করতে ব্যর্থ হওয়া। বস্তুত, দুর্নীতি দূর করতে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার আরও ২ শতাংশ বেড়ে যেত বলে অনেকে মনে করেন। রাষ্ট্রকাঠামো ব্যবহার করে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নপ্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে সরকারদলীয় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারার অক্ষমতা বা অনিচ্ছার যে দীর্ঘ ট্র্যাডিশন, তা থেকে গত দশ বছরেও আওয়ামী লীগের বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক খাতে উন্নয়নের হাওয়া লাগার পাশাপাশি ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যের মাত্রাও বেড়েছে প্রকটভাবে, যদিও এ সময় দারিদ্র্যের হারও হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। তবে 'বাংলাদেশ বিপ্লবের' যে ধারণা, অর্থাৎ ন্যূনতম সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা, সেটি এখনো রয়ে গেছে বহুদূর।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের দর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি কোন পথে এগোবে, তা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সাধারণত একটি রাষ্ট্রে বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর সে বিপ্লবের আলোকে ক্রমান্বয়ে সে রাষ্ট্রটিকে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা একটি উদার গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুত্ববাদী রাষ্ট্র নির্মাণের পথ থেকে সরে গিয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করল। পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসকেরা এরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন গণতন্ত্রের বাতাবরণে। এর সঙ্গে তাঁরা পথ তৈরি করেছেন ইসলাম পন্থার রাজনীতির বিকাশ ও প্রসারের। পাকিস্তান আমলের মতোই রাষ্ট্রকে অমুসলিম সম্প্রদায় থেকে তাত্ত্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছেন। সামরিক শাসনোত্তর পর্বেও সামরিক শাসনজাত দল বিএনপি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ইস্যুতে সামরিক শাসকদের উত্তরাধিকারই বহন করেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও এখনো পর্যন্ত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের অঙ্গীকারবদ্ধ ভাবমূর্তি জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি। গভীর রাষ্ট্রের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংসক্তির যে হাইপোথিসিস, এটা সঠিক হলে অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুত্ববাদী গণতন্ত্র আরও দীর্ঘদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখা যাবে না, যদিও এ ধরনের সংসক্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সামনে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে।

টীকা

১. Rupert Emerson (1960), Myron Weiner (1967), Samuel P. Huntington থেকে শুরু করে উন্নয়ন ধারণার আধুনিকায়ন তত্ত্ববিদ নামে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা সবাই জাতিরাষ্ট্র ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। এ ধারণার মূল বক্তব্য হলো, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আপেক্ষিকভাবে সমস্বত্ব একটি জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী চেতনায় আবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এ ধরনের একটি জাতিগোষ্ঠী এবং তার ভিত্তিতে একটি জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে উঠবে বলে মনে করা হয়। নিম্নোক্ত গ্রন্থ দুটি জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতিরাষ্ট্র—এসব বিষয়কে আধুনিকায়নের তত্ত্ববিদেরা কীভাবে দেখেছেন, তার ধারণা পেতে সাহায্য করবে।

২. ওয়ালজারের ধারণার জন্য দেখুন, Walzer 2007. বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে আরও দেখুন, Rosenberg, 2001, Burtenshaw 1968.

৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রের ধারণা নেওয়া হয়েছে Dani এবং de Haan (2008) সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে।

৪. এ ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কর্তৃত্ববাদী শাসনের রূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন Richard Shorten (2012).

৫. এ প্রবন্ধে ডেভিড ইস্টন যে অর্থে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন, সে অর্থে, অর্থাৎ অনেকটা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, Easton (1971).

৬. ফিশম্যান (১৯৯০) রেজিমকে বর্ণনা করেছেন, 'more permanent form of political organization' বলে।

৭. এলিট বলতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও এ বর্গে পড়েন।

৮. হাসান আল বান্না এবং সাইয়্যেদ কুতবকে অনুসরণ করে মওদুদী ইসলামকে শুধু ধর্ম নয়, বরং একই সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবেও দেখতেন। উপরিউক্ত তিনজনই ইসলামকে রাজনৈতিক তত্ত্বে রূপান্তরিত করেছেন। মওদুদীর চিন্তাধারা ও ইসলাম পন্থার রাজনীতির বিকাশে এর ভূমিকা-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দেখুন, Nasr, 1996.

৯. 'বাংলাদেশ বিপ্লব' বা মুক্তিযুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধ প্রকল্প এ কারণে বলা হচ্ছে না, কারণ এ বিপ্লবে সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য যেমন এক ছিল না, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনগোষ্ঠীর এলিট অংশটি স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে দরিদ্র, প্রাকৃত জনগোষ্ঠী যারা ছিল এ বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি, তারা স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন রাষ্ট্র ন্যূনতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিত করবে।

১০. এখানে উল্লেখ্য, প্রধান ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামসহ প্রায় সব ইসলাম পন্থার দাবিদার দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত মুক্তিসংগ্রামের বিপক্ষে গিয়ে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়। সামরিক জান্তার সহযোগী হিসেবে ১৯৭১ সালে গণহত্যায় তাদের অনেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আর যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি, তারা কোনোভাবেই এ গণহত্যার বিরোধিতা করেনি। গণহত্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর সব ধরনের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইসলামপন্থী না হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ভিত্তিক মুসলিম লীগও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সহযোগিতা করার অভিযোগে।

১১. বাংলাদেশে ইসলামি জনপরিমণ্ডল-সংক্রান্ত ধারণার জন্য দেখুন, Riaz, 2013।

১২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ধারণার জন্য দেখুন Goldsmith (2018), Osnos (2018).

তথ্যসূত্র

Alavi, Hamza. 'The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh.' *New Left Review*. July-August, 1972.

Burtenshaw, Claude J. 'The Political Theory of Pluralist Democracy', *The Western Political Quarterly*, 21(4), 1968. pp. 577-587.

Dani, Anis A. and Arjan de Haan. *Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities (New Frontiers of Social Policy)*, World Bank Publications, 2008.

Diamond, Larry. 'Thinking about Hybrid Regimes,' *Journal of Democracy*, 13(2), 2002. Pp. 21-35.

Easton, David. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Knopf, 1971.

Emerson, Rupert. *From Empire to Nation: The Rise of Self-Assertion of Asian and African People*. Harvard University Press, 1960.

Fishman, Robert M. 'Rethinking State and Regime: Southern Europe's Transition to Democracy,' *World Politics*, 42(3), 1990. pp. 422-440.

Goldsmith, Jack. 'The "deep state" is real. But are its leaks against Trump justified?' *The Guardian*, April 22, 2018. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/22/leaks-trump-deep-state-fbi-cia-michael-flynn (accessed, November 8, 2018) .

Huntington, Samuel P. *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity*. Simon & Schuster, 2005.

Linz, Juan J. *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. Lynne Rienner Publishers, 2001.

Maniruzzaman, Talukdar. *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*. University Press Ltd, 1980.

Nasr, Vali Reza. *Maududi and the Making of Islamic Revivalism*. Oxford University Press, 1996.

Osnos, Evan. 'Trump VS. The Deep State.' *The New Yorker*. May 21, 2018. (https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/21/trump-vs-the-deep-state (accessed November 7, 2018).

Riaz, Ali and Kh. Ali Ar Raji. (2011). 'Who Are the Islamists?' in Ali Riaz and C. Christine Fair (Eds.), *Political Islam and Governance in Bangladesh*. London and New York: Routledge. Pp 46–70.

Riaz, Ali. (2013). 'The New Islamist Public Sphere in Bangladesh.' *Global Change, Peace & Security* 25(3): 299–312.

Rosenberg, Goran. 'A Pluralist Democracy', *Eurozone*, November 27, 2001. https://www.eurozine.com/a-pluralist-democracy/ (accessed October 7, 2018).

Sekiguchi, Masashi. *Government and Politics* (Volume I). EOLSS Publication, 2010.

Shorten, Richard. *Modernism and Totalitarianism: Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present*. Palgrave Macmillan, 2012.

Walzer, Michael. 'Pluralism and Democracy', *The Atlantic*, November 2007. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/11/pluralism-and-democracy/306321/ (accessed October 7, 2018).

Weiner, Myron. *Party Building in a New Nation: the Indian National Congress*. University of Chicago Press, 1967.

উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের উন্নয়ন পথরেখা : ব্যতিক্রমী অর্জনের প্রেক্ষাপটে আগামীর চ্যালেঞ্জ

মোস্তাফিজুর রহমান

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা-পরবর্তী উন্নয়ন পথপরিক্রমায় আর্থসামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অর্জন আছে, যা যুক্তিসংগতভাবেই আমাদের গৌরব ও অহংকারের কারণ। এ অর্জন বাংলাদেশকে শক্ত একটি ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে, জাতিকে করেছে আত্মবিশ্বাসী। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া ও নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া—এ দ্বৈত উত্তরণের মধ্যে বাংলাদেশের এসব অর্জনের স্বীকৃতি আছে। কিন্তু আগামীর উন্নয়ন যাত্রাপথকে অতীতের অর্জনের ধারাবাহিকতার সরলরৈখিক সম্প্রসারণ হিসেবে মনে করা হবে ভুল। দারিদ্র্যের অবসান, ক্ষুধামুক্তি, শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফ্যাক্টর-নির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎপাদনশীলতানির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন, উন্নয়ন-রাষ্ট্র থেকে উদ্যোক্তা রাষ্ট্রে রূপান্তর ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করার ওপরই নির্ভর করবে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সামর্থ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন হল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একেকটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলোর ত্রিমাত্রিক সংশ্লেষ নিশ্চিত করতে হলে এবং 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' বলে এসডিজির যে প্রত্যয় রয়েছে, তাকে কার্যকর রূপ দিতে হলে বাংলাদেশকে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা, সাশ্রয়ী অবকাঠামো বিনির্মাণ, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আদায়ের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, মানসম্মত শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা, ট্র্যাডিশনাল অর্থনীতির বিপরীতে ডিজিটাল ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবনির্ভর নতুন অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উন্নয়ন নীতিমালা, আয়বৈষম্য হ্রাস ও বণ্টনের ন্যায্যতা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, অগ্রাভিমুখী পরিকল্পনা, গুণগতভাবে উন্নত ও দক্ষ বাস্তবায়ন সক্ষমতা।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

দ্বৈত উত্তরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, কাঠামোগত পরিবর্তন, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, উদ্যোক্তা রাষ্ট্র

ধারাবাহিক অর্জনের ব্যতিক্রমী পথপরিক্রমা

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ আজ যে পর্যায়ে এসেছে, সেই পথপরিক্রমণ যেকোনো বিচারেই একটি ব্যতিক্রমী যাত্রাপথ। স্বাধীনতা লাভের পর গত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে যে মাত্রায় ও যে পথে সাফল্য অর্জন করেছে, তাকে অনেকেই উন্নয়ন প্যারাডক্স (উন্নয়ন-ধাঁধা) বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্মর্তব্য যে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশকে নিয়ে দুজন স্বনামখ্যাত বিদেশি গবেষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল *বাংলাদেশ: দ্য টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট*। এই বইয়ের মুখবন্ধে তাঁরা লিখেছিলেন, বইটির শিরোনাম 'আ টেস্ট কেস'-এর পরিবর্তে 'দ্য টেস্ট কেস' করার পক্ষে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ রাষ্ট্রটি এত বেশি সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত যে যদি এই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়, তবে বিশ্বের অন্য যেকোনো উন্নয়নশীল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। কেউ কেউ বাংলাদেশের অবস্থাকে একটি তলাবিহীন ঝুড়ির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তা-ও স্মরণ করা যেতে পারে। চলার পথে অনেক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যে বাস্তবানুগ উন্নয়ন নীতিমালার সহায়তায়, শ্রমজীবী মানুষের অবদানে, ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে ও বেসরকারি খাতের কর্মোদ্যোগের সুবাদে আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে, তাতে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এবং নাগরিক হিসেবে আমাদের গর্ব করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা ও কারণ রয়েছে। যাঁরা 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও আশঙ্কা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন, ইতিহাস তাঁদের ভুল প্রমাণ করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অর্জনের প্রতিফলন ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ের দুটি উন্নয়ন মাইলফলকে: ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের মাপকাঠিতে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে (এলএমআইসি) উত্তরণের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ; এবং ২০১৮ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের হিসাবমতে, 'স্বল্পোন্নত দেশ' (বা এলডিসি)-এর তালিকা থেকে বের হয়ে বাংলাদেশ 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই (মাথাপিছু জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক, মানবসম্পদ সূচক) এলডিসি বৈতরণি পার করেছে। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি, কৃষির রূপান্তর, তৈরি পোশাক খাতের আবির্ভাব, প্রবাসীদের পরিশ্রমলব্ধ আয়,

তৃণমূল সংগঠনগুলোর ভূমিকা, সামাজিক আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভাব—এমন অনেক অনুঘটকের ইতিবাচক অভিঘাত বাংলাদেশের দ্বৈত উত্তরণ ও অন্যান্য অর্জনকে সম্ভব করেছে।

প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত রূপান্তর

স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্জনগুলো বুঝতে হলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও খাতে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, জিডিপির কাঠামোগত পরিবর্তন, বহুমাত্রিক বিপন্নতা হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসুবিধার প্রসার, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সংশ্লিষ্ট সেবাগুলোর অগ্রগতি ও সম্প্রসারণ। কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বেড়েছে, কৃষিজমি চাষের নিবিড়তা একের কাছাকাছি থেকে বেড়ে দুই অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলোর ১০ মিলিয়ন টন থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়ে বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে প্রতিবছরে ৩৫ মিলিয়ন টনের কাছাকাছি। ১৯৭০-এর দশকের খাদ্যাভাবের দিনগুলোকে অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা খাতের রপ্তানি আয় আর বৈদেশিক সাহায্যের অনুপাত ছিল ১ : ১, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেটা দাঁড়িয়েছে ১৬ : ১। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ১৯৮০-এর দশকে যেখানে ছিল জিডিপির ৮ শতাংশের বেশি, তা এখন দুই শতাংশের কম। বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর একটি দেশ থেকে বাংলাদেশের রূপান্তর ঘটেছে একটি বাণিজ্যনির্ভর দেশে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের ধারাবাহিক অগ্রসরতা থেকে বাংলাদেশের একটি আশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে ওঠে। ১৯৮০-এর দশকের পরবর্তী সময়ে প্রতি দশকেই বাংলাদেশ তার গড় বার্ষিক দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ করে বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, যে হার বর্তমানে সাড়ে ৭ শতাংশের কাছাকাছি। মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৭৫০ মার্কিন ডলার, যা ক্রয়ক্ষমতার সমতার বিবেচনায় প্রায় ৩ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। জিডিপির কাঠামোতেও এসেছে পরিবর্তন : কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে প্রধানত একটি উৎপাদন ও সেবা খাতনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে (জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯৭০-এর দশকে ৫৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে)। শিল্পনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা-সক্ষম রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের বিকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং বিশ্ব তৈরি পোশাকের বাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক হিসেবে বাংলাদেশ তার অবস্থান

সুসংহত করেছে (এ খাতে রপ্তানির মোট পরিমাণ বর্তমানে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশ)। নারীদের কর্মসুযোগ সৃষ্টি (এ খাতের ৩ দশমিক ৪ মিলিয়ন শ্রমিকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই নারী), ইতিবাচক আর্থসামাজিক অবদান ও নারীর ক্ষমতায়নে এ খাতের অবদান সর্বজনবিদিত।

এমডিজির নিরিখে বিবেচনা করলে, বাংলাদেশের সফলতা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত—আয় বেড়েছে, আয়ুও বেড়েছে, কমেছে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের অংশ (১৯৯০-এর ৫৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশে; একই সময়ে অতিদারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২২ থেকে ১১ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে)। প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এখন প্রায় সব শিশু (প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি এবং জেন্ডার সমতা); স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতার প্রতিফলন ঘটেছে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাসের মধ্য দিয়ে; নিরাপদ সুপেয় পানির লভ্যতা পেয়েছে বিস্তৃতি; বেড়েছে সাক্ষরতার হার। একটি বিশেষ সূচকের মধ্যে আর্থসামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের অর্জনের নির্যাস ফুটে ওঠে: বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুর পরিবর্তন—স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৪৯ বছর, যা বর্তমানে উন্নীত হয়েছে ৭১ বছরে। ২০০৫ সালে বিদ্যুৎ-সেবার সুবিধা পেত ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ নাগরিক, যা বর্তমানে ৭০ শতাংশের বেশি। ২০০৫ সালের ৬ দশমিক ৩ শতাংশের তুলনায় ২০১৫ সালে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে ৮১ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। বর্তমানে দেশের ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যা ২০০৫ সালে ছিল মাত্র ১ শতাংশ।

বাংলাদেশের আগামী দিনের অর্জনে সরকার ও নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা থাকতে হবে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত নেয়—বাণিজ্য উদারীকরণ, আমদানি সহজীকরণ, রপ্তানিমুখিতা, বেসরকারীকরণ। আগেকার রাষ্ট্রীয় মালিকানানির্ভর অর্থনীতি থেকে সরে এসে একটি বাজারনির্ভর ও মূলত ব্যক্তি খাতকেন্দ্রিক অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূলধারায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির এ পথপরিক্রমা ও রূপান্তর সহজ ছিল না, কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিবর্তনমুখী অর্থনীতির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ও বিকাশমান সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে এবং বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে। বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্মুক্ততার সূচক (জিডিপিতে আমদানি-রপ্তানির অংশ) ১৯৯০-৯১ সালের ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ সালে দ্বিগুণ হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের এ পথপরিক্রমায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ যেমন সামর্থ্য ও সাফল্য প্রদর্শন করেছে, তেমনি উন্নয়ন সম্ভাবনার

সুযোগগুলোকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে আরও শক্তিমত্তা প্রদর্শনের সুযোগ ছিল, সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না। যা অর্জিত হয়েছে, দেশ ও জাতি হিসেবে যেকোনো বিচারে তা আমাদের গৌরব ও অহংকার। সে সমালোচনাকে বিবেচনায় নিয়ে তার থেকে শিক্ষা নেওয়ার গুরুত্বও আজ সমধিক। এ কথা সত্য যে শক্ত সমালোচনার শক্তি আদতে শক্তিশালী একটি জাতিরই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। এ শক্তি যেন আমরা কখনো হারিয়ে না ফেলি।

আগামীর পথপরিক্রমা : চ্যালেঞ্জ ও তার মোকাবিলা

স্বাধীনতা-উত্তর আর্থসামাজিক অর্জন বাংলাদেশকে তার সামর্থ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সমধিক সত্য যে আগামী দিনের চলার পথে বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হবে পুরোনো ও নতুন উভয়বিধ চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলো দ্বিমাত্রিক—প্রথমত, চলমান উন্নয়নপ্রক্রিয়ার দুর্বলতাপ্রসূত চ্যালেঞ্জ, যার আশু সমাধান প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন হবে যথাযথ প্রস্তুতি। এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ অতীতে অতিক্রান্ত পথরেখার একটি নিছক সম্প্রসারণ মাত্র হবে না। আগামীর পথে হতে হবে অনেক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন, করতে হবে নতুন পথের সন্ধান। ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি, বিকাশমান সম্ভাবনা ও অপেক্ষমাণ সুযোগের সমন্বয়ে সমান্তরাল পথের এক যাত্রার ক্রান্তিলগ্নে আজকের বাংলাদেশ। আর এ যাত্রার যথাযথ প্রস্তুতিই বাংলাদেশের সামনে আজ সময়ের দাবি।

স্মর্তব্য যে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও দেশের ১৬৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এখনো জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে; এক-নবমাংশ বাস করছে অতিদারিদ্র্যসীমার নিচে। শতকরা হিসাবের আড়ালের এ সংখ্যাটি কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ; প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে; এর মধ্যে দেড় কোটির বেশি মানুষকে মুক্ত করতে হবে চরম দারিদ্র্যাবস্থা থেকে। আয়বণ্টনে ন্যায্যতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নিরিখে বিচার করলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত খানা জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে আয়বৈষম্য বেড়ে চলেছে, বাড়ছে সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে কম আয়ের মানুষের মধ্যে পার্থক্য।

প্রতিবছর শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে প্রায় ২০ লাখ মানুষ। তাদের জন্য যথাযথ ও শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের জন্য হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনমিতিক সুযোগ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) কাজে লাগানোর জন্য মানসম্মত এবং শ্রমবাজার ও অর্থনীতির আগামীর চাহিদা উপযোগী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আর সেটা

করতে হবে এখনই। বর্তমানেও অবশ্য অনেক কর্মসূচি ও উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার কার্যকারিতা থেকে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল। শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন খাতে বাংলাদেশের বাজেট বরাদ্দ মোট জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ইউনেসকো প্রস্তাবিত ৪ থেকে ৬ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে শিক্ষিত তরুণদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষিত তরুণের সংখ্যাও। বর্তমানের অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থাননির্ভর শ্রমকাঠামো থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমনির্ভর কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। উদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে, রাজস্ব প্রণোদনা ও আর্থিক নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। কর্মস্থলে যথাযথ শ্রমমান নিশ্চিত করা এবং শোভন কাজের পরিবেশ রক্ষা এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার যেমন করতে হবে, তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের আগামী দিনের প্রবৃদ্ধি, তাতে ত্বরণ সৃষ্টি এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে অবকাঠামোগত ঘাটতি পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। প্রয়োজন হবে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে চাঞ্চল্য আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন হিসাবমতে, বন্দর, সড়ক, রেললাইন নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশকে আগামী এক দশকে এক শ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। এটা সত্য যে এসব খাতে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে (গত এক দশকে প্রায় তিন গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে), বন্দরের সেবার মান বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে (দুটি নতুন বন্দর তৈরি করা হচ্ছে); সড়ক ও রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, মুঠোফোন ও ইন্টারনেট-সেবার সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। যোগাযোগব্যবস্থার অদক্ষতা ও অপ্রতুলতা সর্বজনবিদিত; বন্দরের কর্মদক্ষতার মান, উদ্যোক্তাদের সেবাপ্রাপ্তি ও বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা থেকে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর ফেলছে বিরূপ প্রভাব। বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনামূলক সুবিধাগুলোকে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় রূপান্তর করতে হলে এবং উৎপাদক, বিনিয়োগকারী ও ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে হলে ব্যবসা পরিচালন-সুবিধা ও বিশ্ব প্রতিযোগিতা সক্ষমতা র‍্যাঙ্কিংয়ে ওপরে উঠতে হলে

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে আরও বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ যেমন করতে হবে, তেমনি বিনিয়োগের মান, উৎকর্ষ ও দক্ষতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে। জনগণ ও ব্যবসায়ীদের কাছে ডিজিটাল অর্থনীতি ও ই-গভর্ন্যান্সের সুফল নিয়ে যেতে হলে ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রয়োজন হবে আরও বিনিয়োগের। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। এসব ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত না করা গেলে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ পর্যবসিত হবে উচ্চ সেবামূল্য ও ঋণের ফাঁদে। এসব বিবেচনায় রেখে এখনই বাংলাদেশকে সজাগ ও সতর্ক হতে হবে। গ্রহণ করতে হবে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

বাংলাদেশকে দ্বৈত উত্তরণের সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিঘাত সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের কারণে বাজারসুবিধার ক্ষেত্রে হবে বড় পরিবর্তন, যার ফলে বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা পরিবেশ হবে আরও অনেক প্রতিকূল। সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে ভারত, চীন এবং অন্য দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-সহযোগীদের লাইন অব ক্রেডিট যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে সরকারি, সরকারি-বেসরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান। এসব বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। অবকাঠামোর কারণে যদি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হয়, তবে অবকাঠামোতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণই যৌক্তিক পদক্ষেপ হওয়ার কথা। এবং সে প্রেক্ষাপটে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল শক্তিশালী ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব অন্তত কয়েকটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও চালু করতে পারলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য তা হবে একটি বড় ধরনের গেম চেঞ্জার। আর সেটা করতে হলে ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড এবং সরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

আগামীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ঋণ পরিষেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রেকর্ড যদিও খুবই ভালো, ভবিষ্যতে এ দায়ভার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে। অর্থ আহরণের জন্য বাংলাদেশকে সক্রিয়ভাবে বিকল্প নতুন অর্থায়নের উৎস খুঁজতে হবে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, বাজারে সভরেইন বন্ড অবমুক্তি এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যাংক, নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও অন্যান্য সম্ভাব্য দক্ষিণ-দক্ষিণ ও মিশ্র (ব্লেন্ডেড) আর্থিক উৎসগুলো থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে বাংলাদেশকে আরও গুরুত্বারোপ করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান

রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ১০ শতাংশ, যা এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশের মধ্যেও সর্বনিম্ন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আরও অধিকসংখ্যক কর প্রদান সক্ষম জনগণকে করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে, কর ফাঁকি হ্রাস করতে হবে; অবৈধ অর্থ পাচার কমিয়ে আনতে হবে; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা বাড়াতে হবে। কর কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে বর্তমানের পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা (মোট কর আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ) হ্রাস করে প্রত্যক্ষ কর, বিশেষভাবে ব্যক্তি আয়করের অংশ (মোট কর আয়ের এক-দশমাংশ) উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো যায়। এনবিআরের সংস্কার কর্মসূচিকে বেগবান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন, করবান্ধব প্রশাসন, প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধি, ট্রান্সফার প্রাইসিং সেলের শক্তিশালীকরণ এবং আমদানি পর্যায়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও এনবিআরের মধ্যে সমন্বয়কে জোরদার করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ভ্যাট আইন কার্যকর করতে হলে এখনই প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ করে রাখতে হবে।

এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সহযোগিতার যে সম্ভাব্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল মোটর ভেহিকল অ্যাগ্রিমেন্ট (বিবিআইএনএমভিএ), বিসিআইএম-ইকোনমিক করিডর, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই), উপ-আঞ্চলিক এনার্জি গ্রিড, হিমালয়-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার জলজ সম্পদের যৌথ অনুসন্ধান এবং ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনার কথা। সম্ভাব্য সুফল লাভের জন্য যোগাযোগ, বাণিজ্য, পরিবহন, বিনিয়োগ এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগের ক্ষেত্রে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ পাঁচ সংযোগের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। ট্রান্সপোর্ট করিডরকে রূপান্তরিত করতে হবে বিনিয়োগ করিডরে এবং অর্থনৈতিক করিডরে। বাংলাদেশকে যদি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিবহন ও উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে হয় এবং বঙ্গোপসাগরের প্রবেশদ্বারের সুযোগকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে হয়, তবে নিষ্কণ্টক যোগাযোগব্যবস্থা এবং বন্দর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) মতে, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিবেশঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি। বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণামতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ৬৫ সেন্টিমিটার বাড়লে এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৪০ শতাংশ উৎপাদনক্ষম জমি জলসীমার নিচে ডুবে যাবে। বিশেষজ্ঞরা ২০৮০ সালের মধ্যেই এমনটা ঘটার আশঙ্কা করছেন। এর ফলে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে খাদ্যনিরাপত্তার জন্য, যার পরিণাম হবে ভয়াবহ। উপকূলীয় অঞ্চলের দুই কোটি মানুষ ইতিমধ্যে উচ্চ লবণাক্ততা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। ভবিষ্যতে লবণাক্ততা, নদীভাঙন ও

মরুকরণের গতি বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফসল উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশকে সম্পদের টেকসই ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে; যেমন কৃষিতে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠের পানির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। লবণাক্ততা, বন্যা ও শীত-সহনশীল উচ্চফলনশীল শস্যের জাত উদ্ভাবনে কৃষি গবেষণা খাতে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে। উৎপাদনব্যবস্থায় 'জোনিং'কে উৎসাহিত করতে হবে। এযাবৎকাল ভালো ফল দেওয়া উচ্চফলনশীল কৃষিপদ্ধতি একটি প্রযুক্তি সীমান্তে উপনীত হয়েছে বলেই মনে হয়। পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে হলে বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন প্রজন্মের কৃষিপ্রযুক্তির প্রচলন করতে হবে। গবেষণা ও মানবসম্পদ তৈরিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। খাদ্যনিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি মোকাবিলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক অভিঘাতের প্রশমন ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ব জলবায়ু তহবিলসহ বৈশ্বিক উদ্যোগগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তাপ্রাপ্তির জন্য সোচ্চার ও সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথে সামষ্টিক অর্থনীতির কার্যকর ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়ার সংস্কার এবং উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ব্যতিরেকে সাশ্রয়ী বাস্তবায়ন ও সুশাসন ও জবাবদিহিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। আর সেটা না হলে আগামীর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাও দুরূহ হবে। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের যাত্রাপথে এসব চাহিদা বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিরিখে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আগামীর উন্নয়নের গতিধারা অতীতের সরলরৈখিক সম্প্রসারণ হবে না। অর্থনীতির ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর রয়েছে, যেখানে একটি রাষ্ট্র উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট ধাপে পৌঁছে তারপর থমকে ও থেমে গেছে, আগেকার সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। অর্থনীতির ভাষায় এটাকে মধ্য আয়ের ফাঁদ (মিডল ইনকাম ট্র্যাপ) বলা হয়ে থাকে। স্বল্পোন্নত থেকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত অনেক দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যখন কোনো দেশ

অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে অসমর্থ হয়। এসব দেশ তখন প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয় শ্লথগতির; নিম্ন সঞ্চয়, নিম্ন বিনিয়োগ, নিম্ন সম্পদ প্রাপ্যতার দুষ্টজালে আটকা পড়ে। ফলে ব্যবসা পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাদের দিতে হয় উচ্চ মূল্য, দুর্বল অবকাঠামো এসব অর্থনীতির প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে করে তোলে দুর্বল। ফলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পড়ে ছেদ। আর এসব থেকেই জন্ম নেয় মধ্য আয়ের ফাঁদ। বাংলাদেশকে এ সম্ভাব্য ফাঁদ এড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এ লক্ষ্যে অর্থনীতির যে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজন, তার পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে হবে। সুশাসনের ঘাটতি হ্রাস করতে হবে, উন্নয়ন প্রশাসনের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশের যুব সম্প্রদায় তথা মানবসম্পদের গুণগত উৎকর্ষের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তরুণ প্রজন্ম ও বাংলাদেশের যুবসমাজকে দেশের অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে হবে, তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, বাংলাদেশের ৬২ দশমিক ১ মিলিয়ন কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বয়সই ১৫ থেকে ২৯-এর মধ্য (২০১৬ সালের উপাত্ত)। বস্তুতপক্ষে, ২০৪১ সালের মধ্য একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার যে স্বপ্ন বাংলাদেশ দেখছে, তা অনেকাংশে নির্ভর করবে এ যুবসমাজের শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল আদায় করার সক্ষমতার ওপর। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে। যেমন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লেবার স্টাডিজের ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বিশ্ববাজারে নিকট-প্রতিযোগী কয়েকটি দেশের শ্রমিকদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম। উৎপাদনের উপাদাননির্ভর (ফ্যাক্টর-নির্ভর) অর্থনীতি থেকে উৎপাদনশীলতা নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের সক্ষমতার ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নির্ভর করবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিবিহীন (জবলেস গ্রোথ) প্রবৃদ্ধির যে চ্যালেঞ্জ অনেক উন্নয়নশীল দেশকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে, সে বিষয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে। এ পরিস্থিতিতে অর্থনীতির বৈচিত্র্যায়ণ, সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর এবং নতুন নতুন খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে কর্মসুযোগের একটা সংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় এবং সে কর্মসুযোগকে হতে হবে শোভনকাজের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে কর্মসুযোগ ভালো মজুরি ও ভালো বেতন দেয় এবং যে কর্মপরিবেশ শ্রমিকবান্ধব। বাংলাদেশকে দুটি ধারায় কাজ করতে হবে: ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ

বাজারের চাহিদা পূরণ এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারের সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্ক ও ভ্যালু চেইন গড়ে তোলার দিকে বাংলাদেশকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতা বাড়ানোর নিমিত্তে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পথে যেতে হবে। গতানুগতিক বাণিজ্য চুক্তির বাইরে সার্বিক ও সর্বব্যাপী সহযোগিতাধর্মী চুক্তির দিকে যেতে হবে। এসব আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে দর-কষাকষির দক্ষতা বাড়াতে হবে। রপ্তানি ও বাজার বৈচিত্র্যায়ণকে নীতি সমর্থন এবং সুনির্দিষ্ট আর্থিক, রাজস্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একই সঙ্গে সুযোগ ও শঙ্কার কারণ হবে। বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির ডিজিটাল উত্তরণ ও রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়নে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার খুবই সীমিত। ইন্টারনেট সংযোগের গতি বৃদ্ধি, গ্রাহক ও ভোক্তাপর্যায়ে মূল্য হ্রাস, তথ্য সংরক্ষণ এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অনলাইন বাণিজ্য ও সেবা খাতের বিকাশে সহায়তা করতে হবে, সফটওয়্যার, আউটসোর্সিংসহ নতুন অর্থনীতির (প্রথাগত অর্থনীতির বিপরীতে) খাতগুলো যেন প্রয়োজনীয় প্রণোদনা পায়। শুদ্ধাচার ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত, প্রস্তাবিত ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণব্যবস্থার প্রচলনসহ বেশ কিছু উদ্যোগ ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ হিসেবে। অ্যাজেন্ডা ২০৩০-এর মূল দর্শন হলো, কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না (লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড)। সমাজে যারা পিছিয়ে আছে, বিভিন্ন ভঙ্গুরতার দ্বারা আক্রান্ত, প্রান্তজন-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাংলাদেশের জিনি কোইফিশিয়েন্ট (আয়বৈষম্যের সূচক) ১৯৮৪ সালে ছিল শূন্য দশমিক ৩৫, যা ২০১৬ সালে বেড়ে শূন্য দশমিক ৪৮ হয়েছে। ২০১৬ সালে দেশের সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশ নাগরিকের আয় সর্বনিম্ন গরিব ৪০ শতাংশ নাগরিকের আয়ের ২ দশমিক ৯ গুণ ছিল, যা ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ১ দশমিক ৫ গুণ। জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রবৃদ্ধির দিকে সচেতন থাকলে তা বৈষম্য হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে; নারীদের সামাজিক গতিশীলতাও বাড়বে। যেহেতু দরিদ্ররা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিতে থাকে, বাংলাদেশে সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন হতে হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনের মূল চালিকা শক্তি। সেসব নীতির ওপর জোর দিতে হবে, যেগুলো একই সঙ্গে বণ্টনে ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং টেকসই উন্নয়ন ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

উপসংহার

বাংলাদেশের অর্জন জনগণকে যেমন আত্মবিশ্বাসী করেছে, তেমনি বেড়েছে তার প্রত্যাশার ব্যাপ্তিও। নতুন প্রজন্মের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস ও প্রত্যাশা আরও বেশি সত্য। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে, তাকে আরও শক্তিশালী করে একবিংশ শতাব্দীতে অগ্রসর হতে হলে, স্থানীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূলের জনগণকে আরও কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রয়োজন হবে এমন একটি বিচারব্যবস্থার, যা হবে স্বাধীন, এমন একটি প্রশাসনযন্ত্র, যা হবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত এবং এমন একটি সংসদীয় ব্যবস্থা, যা হবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথপরিক্রমায় যুক্ত হয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো (এসডিজি) অর্জনের প্রত্যয়, যে উন্নয়ন পথযাত্রায় থাকবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের ত্রিমাত্রিক সংশ্লেষ। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবমতে, আগামী ১৩ বছরে (২০১৮-৩০) এসডিজি বাস্তবায়নে বাড়তি ৯২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে সম্পদ আহরণের চ্যালেঞ্জ যেমন আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ বিতরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আহরণ এবং ফলাফলের বণ্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জ। এগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি পর্যায়েই আছে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা, যা মোকাবিলা করেই বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে। কেবল উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশকে উদ্যোক্তা রাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে হলে বাংলাদেশকে এমন একটি উন্নয়নপ্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে, যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বণ্টনে ন্যায্যতাভিত্তিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই একটি উন্নত বাংলাদেশ আমরা দেখতে পারি। সুস্থ রাজনীতি, সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও আগামীর চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উন্নয়ন-কৌশলের সমর্থনে বর্তমান বাংলাদেশকে প্রত্যাশার সে বাংলাদেশের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অতীত বলে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের জনগণের সে সক্ষমতা আছে।

এশীয় মূল্যবোধ ফিরে দেখা : ইন্টারনেটের ব্যবহার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

ফেই শেন ও লোকমান সুই

সারসংক্ষেপ

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে এশীয় মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার সঙ্গে এশীয় মূল্যবোধের সম্পর্কটি জটিল। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো সেই সম্পর্কের জট খোলা। বিভিন্ন দেশে আমরা জরিপ চালিয়েছি। এর ফলাফলে এশীয় মূল্যবোধ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি দেশ হিসেবে সমর্থনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে দেখলে, এশীয় মূল্যবোধের সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার একটি ইতিবাচক সমর্থন পাওয়া যায়। আর এটা এশীয় মূল্যবোধকে একটি একক ধারণা হিসেবে বিবেচনা করেই পাওয়া যায়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, এশীয় মূল্যবোধ, জনমত, সেন্সরশিপ, আন্তর্জাতিক জরিপ।

ভূমিকা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবুও এশিয়ার অনেক দেশের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে ও অনলাইনে এই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রচণ্ডভাবে খর্বিত হয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার কথা বিবেচনা করে ফ্রিডম হাউস বেশির ভাগ এশীয় দেশকে হয় 'মুক্ত নয়' অথবা 'আংশিক মুক্ত' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১] 'এশীয় মূল্যবোধ' থেসিসের প্রবক্তারা মনে করেন, এশীয় দেশগুলোয় বাক্‌স্বাধীনতায় বিধিনিষেধের ব্যাপারে এখনকার

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

মানুষের সমর্থন আছে বা তাদের কাছে ব্যাপারটি সহনীয়। আসলেই কি এশিয়ার মানুষ এমনটা মনে করে? প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণে মনে হয় যে আমাদের এ ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার সুযোগ আছে: যেমন পিউ রিসার্চের একটি গবেষণায় দেখা যায়, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের ৭০ শতাংশ মানুষ অনলাইনে সেন্সরশিপের বিরোধী।[২]

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে সংযোগ নিয়ে অতীতে যেসব গবেষণা হয়েছে, সেগুলো কোনো মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি।[৩] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই গবেষণাগুলোর বেশির ভাগই করা হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে। তখন এশীয় মূল্যবোধ বিষয়ে বিতর্ক ছিল তুঙ্গে। এর ফলে সেসব গবেষণায় প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন গণমাধ্যমের উত্থানকেও বিবেচনায় নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই নতুন গণমাধ্যম গত দুই দশকে নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে জন্য সমসাময়িক মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে এশীয় মূল্যবোধ বিষয়ে সেই ক্ল্যাসিক বিতর্ক ফিরে দেখা যেমন মূল্যবান, তেমনি প্রয়োজনীয়। এখানে অনলাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। সে জন্যই এই প্রবন্ধে এশীয় মূল্যবোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি এশিয়ার মানুষের সমর্থনের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান, তা গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণার জন্য ১১টি দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপের কাজটি করেছে ইউগভ নামের একটি আন্তর্জাতিক জরিপকারী প্রতিষ্ঠান। এই গবেষণায় তিনটি প্রধান প্রশ্নকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, এশীয় মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত? দ্বিতীয়ত, নতুন গণমাধ্যম প্রযুক্তি (যেমন ইন্টারনেট) ব্যবহার কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি শক্তিশালী সমর্থন জোগায়? এবং তৃতীয়ত, এশীয় মূল্যবোধের একটি একক সমরূপী ধারণার প্রতি সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে এশীয় মূল্যবোধের উপধারাগুলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জোগায় নাকি জোগায় না। পরবর্তী ধাপগুলোয় আমরা প্রথমে এশীয় মূল্যবোধ বিতর্ক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর যেসব লেখাজোখা রয়েছে, সেগুলো আলোচনা করব। এরপর, আমাদের উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি, উপাত্ত বিশ্লেষণের কৌশল, ফলাফল এবং সবশেষে এগুলোর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব।

এশীয় মূল্যবোধ বিতর্ক

১৯৯০ সালের দিকে যখন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, তখন 'এশীয় মূল্যবোধের' ধারণার প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এই আকর্ষণ জনপ্রিয় ধারায় যেমন ছিল, তেমনি ছিল রাজনৈতিক আলোচনায়ও।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ব্যাপারে এশীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমালোচনা আছে, তা দুভাবে দেখা যায়। একটি পক্ষ এশীয় সংস্কৃতির জন্য মানবাধিকার কতটুকু প্রযোজ্য তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অন্যপক্ষ আবার বলে যে এশীয় সংস্কৃতি এখনো মানবাধিকারের জন্য প্রস্তুত নয়। তারা মনে করে আগে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এশীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকারের সমালোচনা করা হয়। সেখানে সম্ভবত মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়ও তা-ই।

এশীয় মূল্যবোধ থেসিসের সমর্থকেরা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে অন্তত দুটি যুক্তি তুলে ধরেন। প্রথম যুক্তিতে ব্যক্তি অধিকারের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। বলা হয় যে এগুলো এশীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অথবা এর সঙ্গে মানানসই নয়। এ ক্ষেত্রে যুক্তি হলো, এশীয় সংস্কৃতিতে একটি সমাজের মৌলিক ভিত্তি ব্যক্তি নয়; বরং পরিবার।[৪] সমালোচকেরা আরও বলেন যে এশীয় সংস্কৃতিতে ব্যক্তির অস্তিত্ব তার পরিবার ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে নিহিত থাকে। এখানে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় ঘরানার যুক্তিতে অবশ্য মানবাধিকারের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় না। কিন্তু বলার চেষ্টা করা হয় যে এশীয় সংস্কৃতি এখনো 'প্রস্তুত' নয়। কারণ, বেশির ভাগই এখনো উন্নয়নশীল দেশ। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকার এখানে মানবাধিকার এবং বাক্‌স্বাধীনতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও একই গুরুত্ব বহন করে।[৫] এই ঘরানার সমালোচকেরা মনে করেন, সুশাসন ও উদার গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক আসলে অতিরঞ্জিত। তাঁদের মতে, এগুলো ছাড়াও আধুনিকতায় পৌঁছানোর আরো অনেক পথ আছে।[৬]

এসব যুক্তির প্রতিক্রিয়ায় অনেক পাল্টা যুক্তি তোলা হয়েছে। সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী পাল্টা যুক্তিটি এসেছে তথাকথিত এশীয় মূল্যবোধের অনটোলজিক্যাল অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে। প্রধান যুক্তি হলো, এটা আসলে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ চেতনার বিচারে খুব একটা 'এশীয়' নয়।[৭] অন্য অনেকে বলতে চেয়েছেন যে এশিয়া কোনো সমগোত্রীয় ভৌগোলিক সত্তা নয়। ফলে পুরো অঞ্চলকে একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধের সুতায় বাঁধা যাবে না।[৮] এ ছাড়া অন্যরা দাবি করেছেন যে এশীয় মূল্যবোধ থেসিস আসলে তুলে ধরা হয়েছে রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক কারণে। এর সঙ্গে ঐতিহ্যগত এশীয় সমাজের আচার-আচরণের কোনো সম্পর্ক নেই।[৯] বিশেষ করে, এশীয় মূল্যবোধের ধারণা আদতে স্বৈরাচারী শাসনের বৈধতা দেওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ এবং মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট মাহাথির মোহাম্মদ এই ধারণার সবচেয়ে বিখ্যাত ও কড়া সমর্থক বলে পরিচিত।[১০] আরও কিছু পাল্টা যুক্তিতে

এশীয় মূল্যবোধের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। সেখানে দাবি করা হয় যে কনফুসীয় ও অন্যান্য প্রথাগত এশীয় লেখাজোখায় সাংস্কৃতিক আদর্শসহ অন্যান্য এশীয় মূল্যবোধ আসলে গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক নয়; বরং পরিপূরক।[১১]

সব মিলিয়ে এসব গবেষণায় বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত, যেহেতু এই বিতর্কের বেশির ভাগই হয়েছে তাত্ত্বিক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে, কীভাবে একটি গবেষণালব্ধ অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা সামনে এগোতে পারি?[১২] দ্বিতীয়ত, যেহেতু বেশির ভাগ প্রামাণিক গবেষণা করা হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগে, সে ক্ষেত্রে ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রযুক্তির এই যুগে বাক্‌স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এশীয় মূল্যবোধ কীভাবে নিশ্চল থাকবে?[১৩]

এশিয়ায় বাক্‌স্বাধীনতা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা

বাক্‌স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা বা সংজ্ঞায়িত করার অনেক পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদ একটি কার্যকরী সূচনাবিন্দু : 'প্রত্যেকেরই মত ও বাক্ প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে; এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের মতামত গ্রহণের স্বাধীনতা এবং যেকোনো মাধ্যম থেকেই তথ্য ও ধারণা খোঁজা, গ্রহণ করা, প্রদান করা এবং তা সীমানানির্বিশেষে।'

এশীয় মূল্যবোধ বিষয়ে বিতর্কের প্রেক্ষাপটে এই সংজ্ঞা থেকে দুটো বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, অধিকার প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য; এটা সঠিক কি না, সেই প্রশ্ন অবশ্যই এশীয় মূল্যবোধ বিষয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয়ত, এই অধিকার একদিকে যেমন প্রযুক্তি-নিরপেক্ষ ('যেকোনো মাধ্যমের মাধ্যমে') তেমনি বৈশ্বিক ('সীমানানির্বিশেষে')। প্রযুক্তিগত নিরপেক্ষতার ব্যাপারে দাবির বিষয়ে বলা যায় প্রকাশভঙ্গি যেকোনো মাধ্যমনির্বিশেষে স্বাধীন হওয়া উচিত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, নতুন প্রযুক্তি 'স্বাধীন প্রকাশভঙ্গি' বদলে দিতে পারে। যেমন বালকিন মনে করেন, ইন্টারনেটের কারণে স্বাধীন প্রকাশভঙ্গি চরমভাবে বদলে যায়।[১৪] স্বাধীন প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে আগের যুক্তিগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল সত্য আবিষ্কার এবং ধারণার পসার আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে স্বাধীন প্রকাশভঙ্গির গুরুত্ব;[১৫] আত্মশাসনের ক্ষেত্রে যেকোনো জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা;[১৬] অথবা, এটা মানুষের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য অপরিহার্য।[১৭] বালকিন এসব তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর যুক্তি খাড়া করেছেন। এর ফলে আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছেন যে ইন্টারনেট শুধু বাক্ প্রকাশের বাধাই কমায় না; বরং পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় যে কাউকে 'অর্থ-সৃষ্টিকারী' প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে, যা এত দিন পর্যন্ত ছিল গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রকাশনার একেবারেই নিজস্ব ক্ষেত্র।[১৮] অন্যভাবে বলতে গেলে, ইন্টারনেট আমাদের স্বাধীন প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে পুনরায় ভাবতে চ্যালেঞ্জ

করছে শুধু সত্য, আত্মশাসন ও স্বায়ত্তশাসনের জন্যই নয়। এ ছাড়া ইন্টারনেট কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি লালন করতে পারে, যেখানে সবাই অর্থ-সৃষ্টিতে অংশ নিতে পারে, সে ব্যাপারেও আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে।

যে যুক্তিতে বলা হয়েছে যে বাক্‌স্বাধীনতা সীমানানির্বিশেষে বজায় থাকবে, সে ব্যাপারে বেশ কিছু এশীয় সরকার বিরোধিতা করেছে। বিশেষ করে তাদের যখন মনে হয়েছে যে তাদের শাসন ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব ইন্টারনেট নামের এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, তখন তারা এর বিরোধিতা করেছে। ইন্টারনেটের আবিষ্কার ও ব্যাপকহারে জনপ্রিয়তার ফলে জাতি-রাষ্ট্র ও সীমানার ধারণাকে মৌলিকভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।[১৯] যাহোক, বছরের পর বছর ধরে, ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারগুলো বিভিন্ন পন্থা ও ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছে।[২০] বেইজিং তাদের ইন্টারনেট সেন্সরশিপ চর্চাকে জায়েজ করতে 'ইন্টারনেট সার্বভৌমত্ব' নামে একটি ভাষ্য প্রচার করছে। ধারণা হিসেবে ইন্টারনেট সার্বভৌমত্ব প্রথম উল্লেখ করা হয় ২০১০ সালের শ্বেতপত্রে। সেখানে বলা হয় যে 'চীনের সীমানার ভেতরে ইন্টারনেট চীনের সার্বভৌমত্বের আওতাধীন।' সার্বভৌমত্বের প্রতি এই বাঁক পরিবর্তন বুঝতে গেলে আমাদের ২০১৩ সালের স্নোডেনের তথ্য ফাঁসের ঘটনা বুঝতে হবে। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হলো, হয়তো সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে এই ঝোঁক বেইজিংয়ের একার নেতৃত্বেই চলত, কিন্তু ক্রমাগত অন্যান্য সরকারও এই ধারাণার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে।

ওয়েবের জন্মলগ্ন থেকে পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ইন্টারনেট স্বাধীনতার সহজাত সংযোগ থাকায় এ ধারণাটি একটি জটিল ও রাজনৈতিকভাবে ভারাক্রান্ত ধারণা।[২১] একটি মুক্ত ইন্টারনেট দুটো মূল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল : সেন্সরশিপ ও সরকার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থেকে প্রকাশভঙ্গির মুক্তি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে জনগণের অধিকার, যেন সমাজের সব ধরনের কণ্ঠস্বর উঠে আসে। অন্যভাবে বলতে গেলে, নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় প্রকার স্বাধীনতাই ইন্টারনেট স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেতিবাচক স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সেন্সরশিপ থেকে মুক্তি, বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রাপ্তির অধিকার। ইতিবাচক স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা, ভৌত অবকাঠামোয় প্রবেশাধিকার।[২২]

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনায় এশীয় সমাজগুলো অনলাইনের ক্ষেত্রে সীমিত স্বাধীনতা পায়। এশিয়ায় ইন্টারনেটের অবকাঠামোর বিস্তার খুব দ্রুত ঘটছে, কিন্তু তা গড়পড়তার নিচে। আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালে এশিয়ায় ইন্টারনেটের প্রবেশ ঘটেছে ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ। এই হার আফ্রিকার (২৫ দশমিক ১ শতাংশ) চেয়ে বেশি হলেও, ইউরোপ (৭৯ দশমিক ১ শতাংশ) ও আমেরিকার (৬৫ শতাংশ) চেয়ে অনেক কম। জাপান, দক্ষিণ

কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরে শুধু ৮০ শতাংশের বেশি জনগণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। বিপরীতে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতে ইন্টারনেটের বিস্তার তুলনামূলক খুবই কম। [বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ৯ কোটি ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু মোবাইল ফোন অপারেটরদের বৈশ্বিক সংগঠন জিএসএমএ ২০১৮ সালের এপ্রিলে বলেছে, এই সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লাখ। আবার ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটাস এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরেই এই সংখ্যা ৮ কোটি ৩ লাখ ছাড়িয়েছিল।—সম্পাদক]

ইন্টারনেট সংযোগবিহীন মানুষের হার কম হওয়ার পাশাপাশি এশিয়ায় অনেক ধরনের রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কনটেন্ট ব্লক করে দেওয়া থেকে শুরু করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ। এসব সেন্সরশিপের বেশির ভাগেরই কোনো স্বচ্ছতা নেই। থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে, কর্তৃপক্ষের সমালোচনা ও গণজমায়েত প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় অথবা শাস্তির আওতায় আনা হয়। পাকিস্তানে ব্লাসফেমি এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদের কনটেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়ে দেওয়া হয়। মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় সরকারি কর্তৃপক্ষের সমালোচনামুখর কনটেন্ট বেশির ভাগ সময়ই অপসারিত হয়ে যায়।[২৩] চীনে কমিউনিস্ট পার্টির শাসন টিকিয়ে রাখতে সবকিছুই সেন্সর করা হয়, হোক সেটা রাজনীতি, ব্যঙ্গ, গণজমায়েত বা সামাজিক ধারাভাষ্য। সার্বিকভাবে, ফ্রিডম অন দ্য নেট প্রজেক্টের করা মূল্যায়নে দেখা গেছে, এশিয়ার ১৫টি দেশের মধ্যে শুধু জাপান ও ফিলিপাইনকে অপেক্ষাকৃত 'মুক্ত' বলা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে যেমন আমেরিকা ও ইউরোপে বাক্‌স্বাধীনতা অনেক বেশি স্বাধীন এবং সেন্সরশিপ তেমন বেশি নয়।[২৪]

এশিয়ায় ইন্টারনেট স্বাধীনতা সীমিত থাকার কারণ কি এই যে এখানে বেশির ভাগ মানুষ এর বিপক্ষে বা একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না? গত কয়েক বছরে বড় আকারে আন্তদেশীয় অল্পকিছু মতামত জরিপ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নের স্পষ্ট কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম অন ইন্টারন্যাশনাল পলিসি অ্যাটিচিউড ২০টি দেশের ২০ হাজার ৫১২ জন উত্তরদাতার একটি আন্তর্জাতিক জরিপ সমন্বয় করে। সেখানে দেখা যায়, গড়ে ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন যে ইন্টারনেটে কী আছে সেটা পড়ার অধিকার তাঁদের আছে।[২৫] পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই সামান্য : আমেরিকা মহাদেশে ৬৭-৮৪ শতাংশ উত্তরদাতা ইন্টারনেটে যেকোনো কনটেন্ট পাওয়ার অধিকারকে সমর্থন করেছেন। এশিয়ায় এই হার ৫২-৮০ শতাংশের মধ্যে।

২০০৯ সালে, ২৬টি দেশে বিবিসি ২৭ হাজার ৯৭৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ওপর একটি জরিপ চালায়। দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া

ও ভারতের বেশির ভাগ উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে ইন্টারনেটের অধিকার প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার বেশির ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে সরকারের কখনোই ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়।[২৬] অতিসম্প্রতি, ২৮টি দেশে পিউ রিসার্চ সেন্টার ৪০ হাজার ৭৮৬ জন মানুষের ওপর একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিবিষয়ক জরিপ চালায়। সেখানে দেখা যায়, আমেরিকানরা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী।[২৭] যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, সেন্সরশিপ ছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের উত্তরের হার লাতিন আমেরিকা (৬১ শতাংশ) ও ইউরোপে (৫৮ শতাংশ) কম এবং এশিয়ায় (৩৮ শতাংশ) আরও কম।

এশীয় মূল্যবোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন

এশীয় মূল্যবোধ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে কোনো প্রামাণিক গবেষণা নেই। কিন্তু অল্প কিছু গবেষণা থেকে আরও গভীরতর অনুসন্ধানের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। যেমন চ্যাং ও চু গবেষণা করে দেখেছেন যে চীন, হংকং ও তাইওয়ানে প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত।[২৮] পার্ক ও শিন গবেষকদ্বয় ইস্ট এশিয়া ব্যারোমিটার সার্ভে ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে দেখা যায়, এশীয় মূল্যবোধ গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে খর্ব করে। কারণ, জনগণ এসব সমাজে স্বৈরাচারী রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে থাকে।[২৯] নাথান একই উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত করেছেন যে কনফুসীয় মূল্যবোধ আটটি এশীয় সমাজে গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব রাখে।[৩০]

কিন্তু সব গবেষণালব্ধ ফলাফল এশীয় মূল্যবোধ থেসিসকে সমর্থন করে না। ডাল্টন ও অং ওয়ার্ল্ড ভ্যালুস সার্ভে ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা উপসংহার টেনেছেন যে গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাব পূর্ব এশীয় ও পশ্চিমা দেশগুলোয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন নয়।[৩১] ফেজার ও সপার দেখেছেন, তাইওয়ানে প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।[৩২] ওয়ার্ল্ড ভ্যালুস সার্ভে ডেটার ওপর ভিত্তি করে ওয়েলজেল দেখেছেন, মুক্তিকামী মূল্যবোধের বিষয়ে এশীয় ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ধরনে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে তা মাত্রার দিক থেকে।[৩৩] অধিকন্তু, জাপান, চীন, হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ১৩টি পশ্চিমা দেশের তুলনা করলে এশীয় মূল্যবোধ থেসিসের বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।[৩৪] সংক্ষেপে বলা যায়, বিদ্যমান গবেষণাগুলো থেকে মিশ্র ফলাফল পাওয়া যায়।

এসব গবেষণা নিঃসন্দেহে মূল্যবান, কিন্তু এগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রথমত, বিভিন্ন গবেষণার মধ্যে তুলনায় এশীয় মূল্যবোধের ধারণায়ন ও প্রয়োগ

ঘটে ভিন্নভাবে। যেমন পার্ক ও শিন এশীয় মূল্যবোধের ধারণায়ন করেছেন গোষ্ঠী সংগতির প্রেক্ষাপটে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা চারটি সূচক ব্যবহার করেছেন : সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ বা হাইয়ারার্কি, সামাজিক সংগতি বা হারমোনি, গোষ্ঠী প্রাধান্য এবং বহুত্ববাদ বিরোধিতা।[৩৫] চ্যাং ও চু কনফুসীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে সূচক ব্যবহার করেছেন। যেমন আনুগত্য, অধ্যবসায় ও লিঙ্গ নিরপেক্ষতা।[৩৬] ডাল্টন ও অং এশীয় মূল্যবোধকে ধারণায়ন করেছেন স্বৈরাচারী প্রবণতার আলোকে। তাঁরা ছয়টি সূচক ব্যবহার করেছেন : পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, পিতা-মাতাকে গর্বিত করা, আনুগত্য, কাজের নির্দেশনা এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা।[৩৭] এশীয় মূল্যবোধ পরিমাপ করা সব গবেষণায় স্বৈরাচারী ঝোঁক সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ মেট্রিক। কিন্তু এসব গবেষণা অনুযায়ী, স্বৈরাচারী ঝোঁকের প্রতি একচ্ছত্র জোর দেওয়ার ফলে এশীয় মূল্যবোধের অন্যান্য সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ দিক বাদ পড়ে যেতে পারে।

এশীয় মূল্যবোধ বোঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। এশীয় মূল্যবোধও কোনো সমধর্মী ধারণা নয়। এশীয় মূল্যবোধ সম্ভবত সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় বহুমাত্রিক হিসেবে, যার বিভিন্ন উপধারা রয়েছে। বিদ্যমান গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনায়, এশীয় মূল্যবোধ পরিমাপ করার একটি 'সঠিক' বা 'বিশুদ্ধ' পদ্ধতি খুঁজে বের করতে আমরা খুব বেশি আগ্রহী নই। এর পরিবর্তে আমাদের উদ্দেশ্য হলো এশীয় মূল্যবোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করা। অতএব, এশীয় মূল্যবোধ পরিমাপের আরেকটি ভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের গবেষণায় আমরা এশীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে বিতর্কের পেছনে বিভিন্ন গতিশীলতা ও জটিলতা বুঝতে একটি তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। আরও স্পষ্ট করে বললে, এশীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণার[৩৮] বিষয়গুলো তুলনা করে আমরা এই গবেষণায় এশীয় মূল্যবোধ পরিমাপের জন্য দুটি বিদ্যমান স্কেল[৩৯] ব্যবহার করেছি। এখানে আমরা সাতটি মাত্রা ব্যবহার করেছি : সংহতিবাদ বা কালেকটিভিজম, আদর্শ অনুসরণ বা নর্ম কনফর্মিটি, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ, পারিবারিক স্বীকৃতির জন্য অর্জন, নম্রতা, খাঁটি ভক্তি এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য। আমরা বিশ্বাস করি যে পরিমাপের এই মাত্রাগুলোর তালিকা পূর্ববর্তী একই রকম তালিকার চেয়ে বেশি বিস্তৃত।

আগের গবেষণাগুলোর পরস্পরবিরোধী ফলাফলের একটি কারণ হতে পারে বিশ্লেষণের মাত্রা। সব এশীয় মানুষ এশীয় মূল্যবোধ ধারণ করে—এমন ধরে নেওয়া যুক্তিগতভাবে ভুল। অন্যভাবে বলতে গেলে সমষ্টিগত পর্যায়ে[৪০] বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির ঝুঁকি থাকে। তবুও প্রায় সব বিদ্যমান গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে একটি

মাত্র বিশ্লেষণের পর্যায়েই। মানুষের বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে এশীয় মূল্যবোধ কীভাবে প্রভাব রাখে, তা বুঝতে হলে সামাজিক ও ব্যক্তিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে হবে। এর ফলে একই সঙ্গে দুটো প্রশ্নের সৃষ্টি হয়: (১) যেসব দেশে এশীয় মূল্যবোধের প্রভাব বেশি, সেখানে কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি মানুষের সমর্থন কম (সামষ্টিক-সামাজিক)? এবং (২) যেসব মানুষ এশীয় মূল্যবোধ বেশি আকারে ধারণ করে, তারা কি তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলিদানে ইচ্ছুক (ক্ষুদ্র-ব্যক্তিক)? যদি এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে পার্থক্য হয়, তাহলে বলতে হবে এখানে বিভ্রান্তিমূলক ও মিশ্র চলক কাজ করছে। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে অনুভূত সম্পর্ক হতে পারে কৃত্রিম।

তৃতীয় আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো, আগের প্রায় সব গবেষণায় গণতান্ত্রিক বা মুক্তিকামী মূল্যবোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো বেশ জটিল গঠনবিন্যাস, যার উপধারাগুলো এশীয় মূল্যবোধের সঙ্গে ভিন্নভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। এই গবেষণাগুলোর মিশ্র ফলাফলের কারণ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বলা যায়, পরিমাপের অসামঞ্জস্যতার ফলে এমন হয়েছে। সে জন্যই ধারণাগত স্পষ্টতার জন্য এই গবেষণায় নির্ভরশীল চলককে শুধু মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় নামিয়ে আনা হয়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। অনেকেই একে এশীয় মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বিতর্কিত মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেন। ব্যাপার হলো, কিছু মানবাধিকার অন্যগুলোর চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়ে থাকে। যেমন ডনেলি মনে করেন, এশীয় মূল্যবোধের বেশির ভাগ সমর্থক অধিকাংশ মানবাধিকারের ব্যাপারে দ্বিমত করেন না, যেমন জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা।[৪১] যেই মানবাধিকার তুলনামূলকভাবে বিতর্কিত তা হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (পাশাপাশি বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা)। এর ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় জোর দেওয়া আমাদের যুক্তিসংগত মনে হয়েছে।

চতুর্থত, সংস্কৃতি কোনো স্থির বিষয় নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি বদলায়, বিশেষ করে বিশ্বায়নের যুগে তা বলাই বাহুল্য। ফলে ইন্টারনেটে মানুষের প্রবেশাধিকার, স্বাধীন প্রকাশভঙ্গির মতো মানবাধিকারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতি বদলে ফেলতে পারে। গণতন্ত্র ও এশীয় মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন বিষয়ে বেশির ভাগ প্রাসঙ্গিক গবেষণার উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে ২০০০ সালের শুরুর দিকে। এই গবেষণাগুলোয় নতুন প্রযুক্তির উত্থানকে বিবেচনায় নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেটা নেওয়া গেলে নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারত। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিভিন্ন পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছেন, নতুন প্রযুক্তির ফলে স্বাধীন প্রকাশভঙ্গির প্রতি মানুষের প্রত্যাশা বাড়তে পারে এবং বাক্‌স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতি বদলে যেতে পারে।[৪২] এ ছাড়া, নজরদারির সমাজের

উত্থানের ফলে এবং এডওয়ার্ড স্নোডেনের তথ্য ফাঁসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ নজরদারির মাধ্যমে স্বাধীন প্রকাশভঙ্গি লঙ্ঘনের ব্যাপারে অনেক বেশি সংবেদনশীল হতে পারে অথবা আরও বেশি সতর্ক হতে পারে।[৪৪] ঘন ঘন ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে নাগরিক কার্যক্রমের[৪৫] সংযোগ থাকার যথেষ্ট দালিলিক প্রমাণ আছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাধীন প্রকাশভঙ্গির প্রতি বৃহত্তর সমর্থনের সংযোগেরও কিছু প্রমাণ আছে। যেমন পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রথমত, তরুণ উত্তরদাতারা বিশেষভাবে ইন্টারনেট সেন্সরশিপের বিরোধী।[৪৬] দ্বিতীয়ত, যেসব দেশে ইন্টারনেটের বিস্তার ঘটেছে বেশি, সেখানে স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন বেশি শক্তিশালী।[৪৭] পারস্পরিক সম্পর্কের পদ্ধতির ব্যাপারে পিউ ব্যাখ্যা দেয়নি, কিন্তু সেখানে একটি অন্তর্নিহিত বার্তা আছে। সেই বার্তায় দেখা যায়, প্রযুক্তির বিস্তার ও ব্যবহার স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন আরও বৃদ্ধি করে। নিসবেত ও অন্যান্য গবেষক দেখেছেন যে বেশি বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার হলে গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের দাবির ওপর অনেক প্রভাব ফেলে। অগণতান্ত্রিক দেশে এই প্রভাব গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় কম।[৪৮] স্টয়শেফ ও নিসবেত গবেষণা করে দেখেন, গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের একটি ইতিবাচক প্রভাব আছে। কিন্তু এই প্রভাব নির্ভর করে ইন্টারনেট বিস্তারের মাত্রার ওপর।[৪৯] এই আলোচনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমাদের এই গবেষণায় নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নগুলো প্রস্তাব করছি।

১. (ক) সমাজপর্যায়ে এবং (খ) ব্যক্তিপর্যায়ে এশীয় মূল্যবোধ কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত?

২. (ক) সমাজপর্যায়ে এবং (খ) ব্যক্তিপর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহার কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত?

৩. এশীয় মূল্যবোধের বিভিন্ন উপধারা কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে একই রকম সম্পর্ক প্রদর্শন করে?

গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণার জন্য ১১টি এশীয় দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি বড় আকারে বহুজাতিক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। দেশগুলো হলো : হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। দুটো বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে এই দেশগুলো বাছাই করা হয়েছে : একটি হলো সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (যেমন যেসব দেশে কনফুসীয়বাদ, বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যান্য এশীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব রয়েছে) এবং অনলাইনে বাক্‌স্বাধীনতার মাত্রা (যেমন মুক্ত, আংশিক মুক্ত এবং মুক্ত নয় এমন ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন রয়েছে)।

জরিপ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইউগভ নামের একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক অনলাইন প্যানেল সার্ভিস প্রোভাইডারকে। প্রতিটি দেশের জন্য নির্ধারিত স্যাম্পল ছিল ৬০০ জন করে। কিন্তু ভারতের স্যাম্পল সাইজ ছিল ১ হাজার জন। ১ থেকে ২৪ আগস্ট ২০১৫ সালে জরিপটি পরিচালনা করা হয়। গড় উত্তর প্রদানের হার ছিল ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ। সর্বমোট ৭ হাজার ৩৫৭ জন উত্তরদাতা অংশ নিয়েছেন। গবেষণার স্যাম্পল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই ১১টি দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়নি। কারণ, আমাদের গবেষণার লক্ষ্যবস্তু ছিল এই দেশগুলোর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। অতএব, প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা এবং আয় বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে কোটা স্যাম্পলিং ব্যবহার করা হয়েছে। বেশির ভাগ দেশের সরকারি পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের প্রোফাইল নেওয়া হয়েছে। যেসব দেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি, সেসব দেশের ক্ষেত্রে প্যানেল অংশগ্রহণকারীদের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের এ গবেষণাটি বাছাই করা দেশগুলোর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিমাপপদ্ধতি

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন

আমরা তিনটি দিক থেকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন পরিমাপ করেছি: ব্যক্তিগত বাক্‌স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা। সব প্রশ্নেই চার পয়েন্টের লাইকার্ট স্কেলে পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে ১ মানে হলো 'একদম দ্বিমত পোষণ' এবং ৪ মানে হলো 'একদম একমত পোষণ'। ব্যক্তিগত বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন পরিমাপ করা হয়েছে একটি একক আইটেমের মাধ্যমে, 'প্রত্যেক ব্যক্তির বাক্ ও মুক্ত প্রকাশভঙ্গির অধিকার আছে' (মিডিয়ান বা এম=৩.৩৭, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা এসডি=০.৬৩৯)। গণমাধ্যমের প্রতি সমর্থন পরিমাপ করা হয়েছে যেই প্রশ্ন দ্বারা তা হলো, 'খবর স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার স্বাধীনতা গণমাধ্যমের রয়েছে' (এম=৩.০০, এসডি=০.৭৭৯)। ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন পরিমাপ করা হয়েছে তিনটি আইটেম দ্বারা (স্বাধীনতা, প্রবেশাধিকার ও উন্মুক্ততা)। প্রশ্নগুলো ছিল: 'ইন্টারনেটে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকতে হবে' (এম=২.৯৫, এসডি=০.৭৮৯); 'ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে' (এম=৩.২৯, এসডি=০.৭১৭); এবং 'ইন্টারনেট মুক্ত ও উন্মুক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ' (এম=৩.১৯, এসডি=০.৭০৬)। এই তিনটি আইটেমের গড় করলে ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের একটি সূচক পাওয়া

যায় (এম=৩.১৪, এসডি=০.৫৬৬, ক্রোনবাস আলফা=০.৬৪৬)।

এশীয় মূল্যবোধ

এশীয় মূল্যবোধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে মোট ১৬টি বিবৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হলো : 'ব্যক্তির মঙ্গলের চেয়ে গোষ্ঠীর মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে' (প্রশ্ন-১, এম=৩.৩৮, এসডি=০.৯৯৬); 'পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ থেকে কারও বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়' (প্রশ্ন-২, এম=৩.৬১, এসডি=০.৯৩১); 'নীরবে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে আবেগ প্রদর্শন করা ভালো' (প্রশ্ন-৩, এম=৩.৫৯, এসডি=০.৯০৫, রিভার্স রিকোডেড); 'পরিবারকে গর্বিত করার গুরুত্বপূর্ণ পথ হলো পেশাগতভাবে সফল হওয়া' (প্রশ্ন-৪, এম=৩.৭২, এসডি=০.৯১৬); 'কারোরই নিজের অর্জন নিয়ে দম্ভ করা উচিত নয়' (প্রশ্ন-৫, এম=৩.৭৩, এসডি=০.৯৩৫); 'পিতা-মাতার সুখের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করা যায়' (প্রশ্ন-৬, এম=৩.৫৬, এসডি=০.৯৮২); 'কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা ভালো' (প্রশ্ন-৭, এম=৩.৪৯, এসডি=০.৯৯৯); 'যে কারোরই যেকোনো প্রচেষ্টা প্রথমত হওয়া উচিত গোষ্ঠীর মঙ্গল রক্ষার্থে, তারপরে ব্যক্তির' (প্রশ্ন-৮, এম=৩.৪৬, এসডি=০.৯২৬); 'পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ' (প্রশ্ন-৯, এম=৩.৭৪, এসডি=০.৮৫০); 'নিজের অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপারে স্পষ্টবাদী হওয়া উচিত' (প্রশ্ন-১০, এম=৩.৭৫, এসডি=০.৭৯৭, রিভার্স রিকোডেড); 'ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলে পরিবার সুখী হয়' (প্রশ্ন-১১, এম=৩.৩৬, এসডি=০.৯৮৯); 'নিজের অর্জন নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়' (প্রশ্ন-১২, এম=৩.৬৫, এসডি=০.৯১৯); 'যা-ই ঘটুক না কেন, একজন পুত্র বা কন্যা হিসেবে পিতা-মাতার কথা অবশ্যই মানতে হবে' (প্রশ্ন-'১৩, এম=৩.১৬, এসডি=১.১৪); 'উর্ধ্বতনের সঙ্গে পুরোপুরি একমত না হলেও তাঁর নির্দেশনা মেনে চলা উচিত' (প্রশ্ন-১৪, এম=৩.০৩, এসডি=০.৯৫২); 'পিতা-মাতা কীভাবে সন্তানদের লালন করেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে' (প্রশ্ন-১৫, এম=৩.৩৬, এসডি=১.০৭৭) এবং 'কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ, যা শিশুদের শেখা উচিত' (প্রশ্ন-১৬, এম=৩.৪৩, এসডি=১.০৪০)।[৫০]

এই ১৬টি আইটেমের গড় করে এশীয় মূল্যবোধের একটি সূচক তৈরি করা হয়েছে (এম=৩.৩৩, এসডি=০.৪৮৯) এবং এই ১৬টি আইটেমের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা দেখে মনে হয় অনেক বেশি (ক্রোনবাস আলফা=০.৮০৮)। ১টি একক সূচক ছাড়াও ৭টি উপসূচক তৈরি করা হয়েছে : সামষ্টিকতা (প্রশ্ন-১, ৮ এম=৩.৪২, এসডি=০.৮৪৬, করিলেশন কোফিশিয়েন্ট বা আর=.৫৫০); আদর্শ মেনে চলা (প্রশ্ন-২, ৯ এম=৩.৬৭, এসডি=০.৭৭৭, আর= .৫২৩); আবেগীয়

নিয়ন্ত্রণ (প্রশ্ন-৩, ১০, এম=১.৩৩, এসডি=০.৭২৬, আর= .৪৫৬); পারিবারিক স্বীকৃতির জন্য অর্জন (প্রশ্ন-৪, ১১, এম=৩.৫৪, এসডি=০.৭৮৪, আর=.৩৫৩); নম্রতা (প্রশ্ন-৫, ১২, এম=৩.৬৯, এসডি=০.৮২৮, আর= .৫৯৫); পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি (প্রশ্ন-৬, ১৩, ১৫, এম=৩.৩৬, এসডি=০.৮৫২, ক্রোনবাস আলফা= ০.৭১৩) এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য (প্রশ্ন-৭, ১৪, ১৬, এম=৩.৩২, এসডি=০.৭৭২, ক্রোনবাস আলফা=০.৬৬৪)।

জনমিতি

বিশ্লেষণে নিয়ন্ত্রণ হিসেবে চারটি জনমিতি চলক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লিঙ্গ একটি ডামি চলক, যেখানে পুরুষকে কোড করা হয়েছে ০ (শূন্য) হিসেবে এবং নারীকে কোড করা হয়েছে ১ হিসেবে (পুরুষ : ৫৮.৮%, নারী : ৪৯.২%)। বয়স একটি ক্রমনির্দেশক চলক। এখানে '২০ বছরের নিচে থেকে ৬০ বছর এবং তার ওপরে' ছয়টি শ্রেণিবিভাগ আছে (মিডিয়ান=৩, ৩০-৩৯)। দেশভেদে বিদ্যালয়ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু একটি একক শিক্ষাগত যোগ্যতার সূচক তৈরি করা হয়েছে: মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা তার নিচে (১৭ দশমিক ৪ শতাংশ), কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা (১৪ দশমিক ৫ শতাংশ) কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় (৫২ দশমিক ৮ শতাংশ) এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা (১৫ দশমিক ৩ শতাংশ)। একইভাবে, আয়ের পরিমাণ দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব, প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মানের আয়ের পরিমাণ হিসাব করে বিস্তর বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

হাইপোথেসিস ও গবেষণা প্রশ্নে আগেই বলা হয়েছে যে এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার, এশীয় মূল্যবোধ এবং ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের মধ্যে সম্পর্ক দেখা। এই গবেষণার জন্য সংগৃহীত উপাত্ত বিভিন্ন দেশের উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এর ফলে উপাত্তের আন্তনির্ভরশীলতার সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। একই দেশের উত্তরদাতাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে পারে। কারণ, তারা একই বৃহৎ সামাজিক পরিবেশের অংশ। এ রকম জোটবদ্ধ উপাত্তকাঠামোয় উপাত্ত বিশ্লেষণের আদর্শ পদ্ধতি হলো বহুপর্যায়ভিত্তিক মডেলিং। বহুপর্যায়ভিত্তিক মডেল তৈরিই হয়েছে এ রকম জোটবদ্ধ কাঠামো থেকে আসা উপাত্ত বিশ্লেষণ করার জন্য। কারণ, প্রথাগত রৈখিক রিগ্রেশন মডেলে স্ট্যান্ডার্ড এররকে কমিয়ে দেখানো হয়। ফলে গবেষণার পরিসংখ্যানকে বেশি করে দেখানো হয়। এই গবেষণায় দুটো বিশ্লেষণের পর্যায় রয়েছে: ব্যক্তিপর্যায়ের উত্তরদাতা (লেভেল ১) এবং দেশীয় পর্যায়ের উত্তরদাতা (লেভেল ২)। আমাদের এই গবেষণার আলোকপাত বিবেচনা করে চারটি প্রেডিক্টরই ব্যক্তিপর্যায়ে করা হয়েছে।

ফলাফল

দেশীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণের এই অংশে, আমরা প্রথমে ১১টি দেশকে চিত্রিত করতে সামষ্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করব। এর ভিত্তিতে আমরা এশীয় মূল্যবোধ, ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি জনগণের সমর্থনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করব। ১ নম্বর চিত্রে ১১টি সমাজের ক্রম অবস্থান অন্যান্য সূচকসহ দেওয়া হয়েছে। (সব চিত্রে ও টেবিলে যেসব মান বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলো আকারহীন এবং এগুলোর ব্যাপ্তি ১ থেকে ৪ পর্যন্ত, যা আদতে নেওয়া হয়েছে লাইকার্ট জরিপের উত্তর থেকে।)

চিত্র ১: (ক) বাক্‌স্বাধীনতা, (খ) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও (গ) ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি দেশভিত্তিক সমর্থন

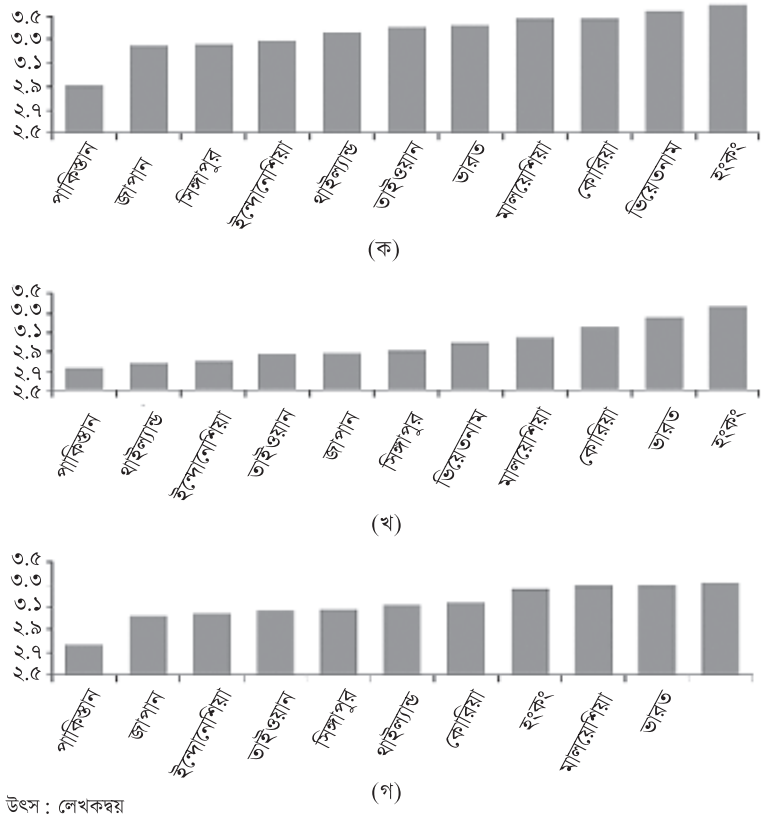

উৎস : লেখকদ্বয়

সামগ্রিকভাবে, বেশির ভাগ এশীয় দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বাক্ ও ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা চেয়েছেন। কিন্তু গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ভিন্নধর্মী মতামত পাওয়া গেছে। সব বিষয়েই পাকিস্তান সম্পূর্ণ চিত্র থেকে আলাদা থেকেছে। পাকিস্তানের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা কোনো ধরনের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেন না।

তিন ধরনের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে এশীয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বাক্স্বাধীনতাকে বেশি সমর্থন করেন (এম=৩.৩৭, এসডি=০.৬৯)। তারপরে রয়েছে ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা (এম=৩.১৪, এসডি=০.৫৭) এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা (এম=৩.০০, এসডি=০.৭৮)।

চিত্র ২ : দেশ অনুযায়ী এশীয় মূল্যবোধ ও বাক্স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন

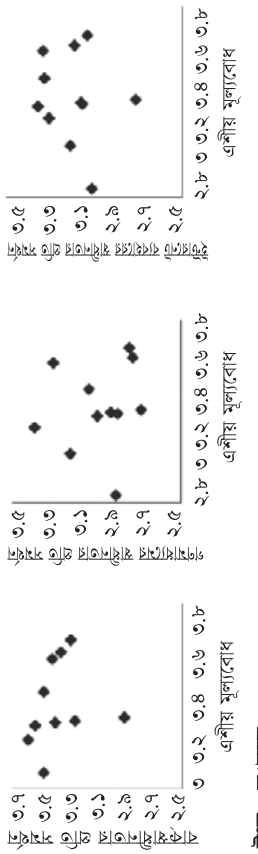

উৎস : লেখকদ্বয়

বাক্স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাকিস্তান ছাড়া বাকি সব দেশে গড় স্কোর ৩-এর চেয়ে বেশি। হংকং ও ভিয়েতনামের স্কোর সবচেয়ে বেশি। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হংকং ও ভারতে শক্তিশালী সমর্থন পাওয়া গেছে, কিন্তু পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে সবচেয়ে কম স্কোর এসেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হংকং, মালয়েশিয়া, ভারত ও ভিয়েতনামের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা শক্তিশালী সমর্থন জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা সবচেয়ে কম সমর্থন জানিয়েছেন।

কিছু ছোট ঘটনা ছাড়া, জিরো-অর্ডার করিলেশন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সামাজিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন প্রচণ্ডভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ও বাক্স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হলো .৯২ (পি<.০০১)। ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হলো .৭২ (পি<.০৫)। বাক্স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হলো .৭২ (পি<.০৫)।

তবে এশীয় মূল্যবোধের স্কোর, এই তিনটি সূচকের সঙ্গে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ে সম্পর্কিত ছিল না। এখানে এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে কম তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণ হতে পারে সামাজিক পর্যায়ে কমসংখ্যক কেস নেওয়া (স্যাম্পল=১১)। অতএব, আমরা এশীয় মূল্যবোধের বিক্ষিপ্ত প্লটগুলো এবং স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সূচকগুলো খতিয়ে দেখেছি। উদ্দেশ্য ছিল অর্থপূর্ণ একটি দ্বিচলক বণ্টনের প্যাটার্ন খতিয়ে দেখা (চিত্র-২)। চিত্রে তিনটি বিক্ষিপ্ত প্লটের মাধ্যমে কোনো স্পষ্ট রৈখিক সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। দেশীয় পর্যায়ে উচ্চমানের এশীয় মূল্যবোধ থাকার মানে এই নয় যে অন্যান্য ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন কম।

চিত্র ৩ : দেশভেদে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা ও ইন্টারনেট স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন

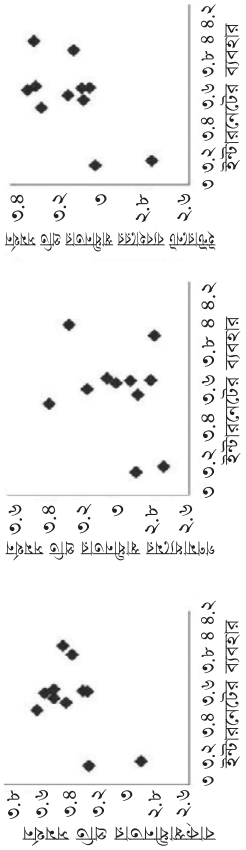

এরপর আমরা খতিয়ে দেখেছি যে স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের তিনটি সূচকের সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রার কোনো সম্পর্ক আছে কি না। ৩ নম্বর চিত্রে গড় ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রার বিপরীতে তিনটি সূচক চিত্রিত হয়েছে। তিনটি নকশায় ইতিবাচক সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে : উচ্চমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহার ঘটলে স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন শক্তিশালী হয়। জিরো-অর্ডার করিলেশন টেস্টে দেখা যায় যে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রার সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে (আর= .৬৫, পি<.০৫), বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে অল্প পরিমাণে সম্পর্ক রয়েছে (আর=.৫৪, পি<.০৯) এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় (আর=.৪০, এন.এস.)।

একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায়, সামাজিক পর্যায়ে উচ্চমাত্রার এশীয় মূল্যবোধ থাকার সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি কম সমর্থনের কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন, বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহারের একটি ইতিবাচক সম্পর্ক আমরা পেয়েছি।

উৎস : লেখকদ্বয়

ব্যক্তিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ

এই অংশে আমরা ব্যক্তিক পর্যায়ে এশীয় মূল্যবোধ, ইন্টারনেটের ব্যবহার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি জনগণের সমর্থনের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করব। উপাত্ত সাজানোর সমস্যা সমাধানে আমরা বহু পর্যায়ভিত্তিক মডেলিং ব্যবহার করেছি। ব্যক্তিক পর্যায়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ফলাফল ১ নম্বর টেবিলে সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণের শুরু হয়েছে প্রতিটি নির্ভরশীল চলকের জন্য একটি নাল মডেল পরীক্ষা করার মাধ্যমে [তুলনার জন্য নাল মডেল ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য হলো, যে বিষয় পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয় কি না তা দেখা। এগুলো সেই বৈশিষ্ট্য, যেগুলো শুধু সম্ভাবনা বা প্রতিবন্ধকতার ফলাফল হিসেবে প্রত্যাশিত নয়—অনুবাদক]। নাল মডেল ANOVA বিশ্লেষণের সমতুল্য। এই বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে আমরা দেখতে পাব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে সমাজভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে কি না। তিনটি সূচকের জন্য এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণির করিলেশন হলো যথাক্রমে ০.০৬, ০.০৭ ও ০.০৯। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে ৬ থেকে ৯ শতাংশ পার্থক্যের কারণ হলো সামাজিক ভিন্নতা। এটা তেমন বেশি নয়।

১, ২ ও ৩ নম্বর মডেলে সব প্রথম পর্যায়ের প্রেডিক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জনমিতি, ইন্টারনেটের ব্যবহার ও এশীয় মূল্যবোধের সামষ্টিক সূচক। দ্বিতীয় পর্যায়ে কমসংখ্যক কেস থাকায়, দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনো প্রেডিক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু সমাজভেদে মডেলের মধ্যে ছেদরেখার পার্থক্য করতে দেওয়া হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায়, নারীর তুলনায় পুরুষ মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বেশি সমর্থন করেন।

ক্রমাগত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরাও অধিক মাত্রায় বাক্‌স্বাধীনতা (বি=০.১৩, পি<.০০১), গণমাধ্যমের স্বাধীনতা (বি=০.১২, পি<.০০১) এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতাকে (বি=০.১৩, পি<.০০১) সমর্থন করেন। মজার ব্যাপার হলো, এশীয় মূল্যবোধ সূচকটি বাক্‌স্বাধীনতা (বি=০.২১, পি<.০০১), গণমাধ্যমের স্বাধীনতা (বি=০.১৮, পি<.০০১) এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার (বি=০.২২, পি<.০০১) ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রেডিক্টর।

এই ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, এশীয় মূল্যবোধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত বলে যে যুক্তি দেওয়া হয় তা সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে, উপাত্ত থেকে বিপরীত সম্পর্কই পাওয়া যায়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ইতিবাচক সম্পর্ক আছে বলে যে যুক্তি, উপাত্ত থেকে সে বিষয়ে আরও শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায়।

সারণি ১ : এশীয় মূল্যবোধ ও ইন্টারনেটের ব্যবহার অনুযায়ী মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন অনুমান করা (নাল মডেল এবং মডেল ১-৩)

	বাক্ স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন	গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন	ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন
	নাল মডেল	নাল মডেল	নাল মডেল
স্থির উপাদান			
ইন্টারসেপ্ট	৩.৩৮***	২.৯৯***	৩.১৩***
র‍্যান্ডম উপাদানগুলোর পার্থক্য			
লেভেল-২ ইন্টারসেপ্ট	০.০৩***	০.০৪***	০.০৩***
লেভেল-১ অবশিষ্টাংশ	০.৪৭	০.৫৭	০.৩০
ডেভিয়েন্স (অনুমিত প্যারামিটারের সংখ্যা)	১৫৩৪১.১৭ (২)	১৬৭৮৯.৯৯ (২)	১১৯৮৫.৫৮ (২)
শ্রেণিভেদে করিলেশন	০.০৬	০.০৭	০.০৯
	মডেল ১	**মডেল ২**	**মডেল ৩**
স্থির উপাদান			
ইন্টারসেপ্ট	২.৩১***	১.৯৯***	২.০৩***
লিঙ্গ	-০.০৪*	-০.০৯***	-০.০৭***
বয়স	০.০১	০.০৩***	-০.০০
শিক্ষা	-০.০০	০.০০	০.০০
আয়	০.০১	০.০১	০.০২***
ইন্টারনেটের ব্যবহার	০.১৩***	০.১২***	০.১৩***
এশীয় মূল্যবোধ	০.২১***	০.১৮***	০.২২***
র‍্যান্ডম উপাদানগুলোর পার্থক্য			
লেভেল-২ ইন্টারসেপ্ট	০.০৩***	০.০৪***	০.০২***
লেভেল-১ অবশিষ্টাংশ	০.৪৫	০.৫৫	০.২৭
ডেভিয়েন্স (অনুমিত প্যারামিটারের সংখ্যা)	১৫০৮৯.২০ (২)	১৬৫৮৮.৪৭ (২)	১১৪৪০.৫৫ (২)

সূত্র : লেখকদ্বয়

টীকা : সব এন্ট্রি আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড কোফিশিয়েন্ট। *পি<০.০৫; **পি<০.০১; ***পি<০.০০১।

এশীয় মূল্যবোধের সব উপধারাই কি একই রকম নমুনা প্রদর্শন করে? এই গবেষণা প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে সব মডেলকে নতুন করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে সামষ্টিক এশীয় মূল্যবোধ পরিমাপের জায়গায় ৭টি উপধারা সূচক প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে। মডেল ৪, ৫ ও ৬ (টেবিল ২)-এর ফলাফলে দেখা যায়, প্রত্যাশার চেয়ে পার্থক্য অনেক কম। মডেলে আলাদা সূচক

সারণি ২ : এশীয় মূল্যবোধ ও ইন্টারনেট ব্যবহার অনুযায়ী মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন অনুমান করা (মডেল ৪-৬)

	বাক্ স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন নাল মডেল	গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন নাল মডেল	ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন নাল মডেল
স্থির উপাদান			
ইন্টারসেপ্ট	২.১০***	১.৮৪***	১.৮৪***
লিঙ্গ	-০.০৫***	-০.১০***	-০.০৯***
বয়স	-০.০১	০.০৩***	০.০০
শিক্ষা	-০.০১	০.০০	-০.০১
আয়	০.০০	০.০০	০.০২**
ইন্টারনেটের ব্যবহার	০.১০***	০.১০***	০.১০***
সামষ্টিকতা	০.০২	০.০৪**	০.০৬***
আদর্শ মেনে চলা	০.০৫***	০.০৫***	০.০৩***
আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ	-০.১৪***	-০.০৯***	-০.১৪***
অর্জন	০.০৩**	০.০৭***	০.০৪***
নম্রতা	০.০৫***	০.০৫***	০.০৪***
পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি	০.০১	-০.০২	-০.০২
কর্তৃপক্ষের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য	-০.০৩*	-০.০৪*	০.০০
র‍্যান্ডম উপাদানগুলোর পার্থক্য			
লেভেল-২ ইন্টারসেপ্ট	০.০৩***	০.০৪***	০.০২***
লেভেল-১ অবশিষ্টাংশ	০.৪৪	০.৫৪	০.২৬
ডেভিয়েন্স (অনুমিত প্যারামিটারের সংখ্যা)	১৪৮৭৮.৯২ (২)	১৬৪৮৩.২৯ (২)	১১০৭৩.৪৪ (২)

সূত্র : লেখকদ্বয়

টীকা : সব এন্ট্রি আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড কোফিশিয়েন্ট। *পি<০.০৫; **পি<০.০১; ***পি<০.০০১।

যুক্ত করলে ভিন্ন ধাঁচ পাওয়া যায়। প্রথমত, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনকে দমন করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই উপধারা তিনটি নির্ভরশীল চলকের সঙ্গেই নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত (বাক্স্বাধীনতা : বি=-০.১৪, পি<.০০১; গণমাধ্যমের স্বাধীনতা : বি=-০.০৯, পি<.০০১; ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা : বি=-০.১৪, পি<.০০১)। দ্বিতীয়ত, কর্তৃপক্ষের প্রতি সশ্রদ্ধ ভক্তি, বাক্স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন (বি=-০.০৩, পি<.০০১) ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের (বি=-০.০৪, পি<.০০১) সঙ্গে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। তৃতীয়ত এবং আশ্চর্যজনকভাবে, সংহতিবাদ বা কালেকটিভিজম, আদর্শ অনুসরণ বা নর্ম কনফর্মিটি, পারিবারিক

স্বীকৃতির জন্য অর্জন এবং নম্রতার মতো ব্যাপারগুলোর সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি ঝোঁক থাকলে তা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের স্কোরও বাড়িয়ে দেয়। 'এশীয় মূল্যবোধ' থেসিসে বলা হয় যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মতো ব্যক্তি অধিকার এশীয় সমাজগুলোর জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, পরিবার এখানে মৌলিক একক। কিন্তু ওপরের ফলাফল থেকে এই এশীয় মূল্যবোধ থেসিসের বিপরীত থেসিস পাওয়া যায়।

আলোচনা ও উপসংহার

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নতুন গণমাধ্যমের এই যুগে প্রামাণিক পদ্ধতিতে এশীয় মূল্যবোধের সঙ্গে মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সম্পর্কের জট খোলা। এই গবেষণার অবদান তিনটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এখানে এশীয় মূল্যবোধ হাইপোথেসিস পরীক্ষা করতে আন্তর্জাতিক প্রামাণিক উপাত্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনলাইনে মুক্ত মতপ্রকাশের ওপর নির্দিষ্ট করে জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই গবেষণা এশীয় মূল্যবোধ থেসিসের আলোচনা ভবিষ্যতে এগিয়ে নিতে একটি প্রামাণিক ভিত্তি প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত, এই গবেষণার মাধ্যমে এশীয় মূল্যবোধ বিতর্কে ফিরে যাওয়ার একটি অর্থপূর্ণ পথ তৈরি করে দিয়েছে। আর তা হয়েছে এমন এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে ব্যাপকভাবে। এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভিন্নভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা এখান থেকে দেখেছি যে 'এশীয়' হওয়া বা 'এশীয়' মূল্যবোধ ধারণ করা মানে এই নয় যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন কম থাকবে। এশীয় মূল্যবোধ কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনকে দমন করে ফেলে? এই প্রশ্নের একটি নির্দিষ্ট উত্তর নেই। কিন্তু আমরা এশীয় মূল্যবোধ থেসিসকে বাতিল করে দেওয়ার যত প্রমাণ পাই, তার সমর্থনে তত প্রমাণ পাইনি। এশীয় মূল্যবোধ থেসিসের সমর্থনে আমরা একটি মাত্র প্রমাণ পেয়েছি। এ প্রমাণটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে। কিন্তু তা আবার এশীয় মূল্যবোধের দুটো উপধারার সঙ্গে সম্পর্কিত : আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য। প্রথমটির মানে হলো নেতিবাচক আবেগ প্রকাশ থেকে সরাসরি বিরত থাকা, আর দ্বিতীয়টির মানে হলো উর্ধ্বতনের নির্দেশ মেনে চলা। দুটো উপাদানই মানুষের সত্যিকারের ভাবনা দমন ও আত্মনিবৃত্তি বা সেলফ সেন্সরশিপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু এশীয় মূল্যবোধ থেসিসের

ব্যাপারে এই স্বল্প প্রমাণও দুটো বড় পাল্টা প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হয়।

প্রথমত, সংহতিবাদ বা কালেকটিভিজম, আদর্শ অনুসরণ বা নর্ম কনফর্মিটি, পারিবারিক অর্জন এবং নম্রতা, ব্যক্তিপর্যায়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। যেসব মানুষ এই মূল্যবোধগুলো ধারণ করে, তারা যারা ধারণ করে না, তাদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা চায়। এই ফলাফলে স্পষ্টই দেখা যায়, তথাকথিত এশীয় মূল্যবোধ একটি একক মূল্যবোধের সমষ্টি নয় এবং তা বিবেচনা করাও উচিত নয়।[৫১] কিছু 'এশীয়' মূল্যবোধ মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনকে দমন করে। কিন্তু অন্যান্য 'এশীয়' মূল্যবোধ বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সমতুল্য। দ্বিতীয়ত, সামাজিক পর্যায়ে, এশীয় মূল্যবোধ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে কোনো অর্থপূর্ণ রৈখিক সম্পর্কের ধরন এই গবেষণায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মতো যেসব দেশে এশীয় মূল্যবোধের মাত্রা বেশি, সেখানেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন অন্য দেশের চেয়ে কম নয়।

ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রভাবের ক্ষেত্রে, আমরা কৌতূহলী ছিলাম দেখার জন্য যে ইন্টারনেটের মতো নতুন প্রযুক্তি মানুষের মুক্তবাক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয় কি না। আমাদের ফলাফলে দেখা যায়, ইন্টারনেটের ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা একটি মুক্তিকামী শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এই ছড়িয়ে পড়ার ফলে এশিয়ায় মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করে। সামাজিক ও ব্যক্তিক উভয়ই পর্যায়েই ইন্টারনেটের ব্যবহার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। যেসব মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তারা মুক্তবাকের পরিবেশের প্রতি বেশি ঝোঁকে। যেসব দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার বেশি, সেখানে বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনও বেশি।

এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, 'এশীয় মূল্যবোধের' ধারণায়ন সব সময় একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল এবং থাকবে। আমরা একটি সামগ্রিক পরিমাপ স্কেল গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি, যা রাজনৈতিক থেকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পর্যন্ত বিস্তৃত। যাহোক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংজ্ঞায়িত করা এবং পরিমাপ করা কঠিন এবং এটাও স্বীকার করা উচিত যে এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ গবেষণাটি বিভিন্ন খাতে করা হয়েছে। এশিয়ায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্ন্যাপশট পাওয়া যায় এই গবেষণায়। এই অঞ্চলে ইন্টারনেটের আরও বিস্তৃতি ঘটলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অতএব, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বদলটা বোঝার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি দালিলিকীকরণ করলে তা ভবিষ্যতে অনেক কাজে দেবে। তৃতীয়ত,

যদিও এ গবেষণাটি ১১টি দেশে বড় আকারের জরিপ চালিয়ে করা হয়েছে, তবুও তা খুব কমসংখ্যক এশীয় দেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। বস্তুত, চীনকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। মূল দেশভিত্তিক তালিকায় চীনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু চীনের একাডেমিয়া ও বাজার গবেষণা শিল্পে ব্যাপকভিত্তিক আত্মনিবৃত্তি থাকায় এ রকম একটি সংবেদনশীল বিষয়ে গবেষণা চালানো সম্ভব হয়নি।

সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই গবেষণায় একটি শক্তিশালী গবেষণালব্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা যায়, 'এশীয়' হওয়া বা 'এশীয়' মূল্যবোধ ধারণ করলেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি মানুষের সমর্থন কম থাকে না। এ ছাড়া দেখা যায়, ইন্টারনেটের ব্যবহার এশিয়ায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অতএব, ইন্টারনেট সেন্সরশিপ করার ক্ষেত্রে এশীয় মূল্যবোধ বা প্রথাগত মূল্যবোধকে জায়েজ করার অস্ত্র হিসেবে নেওয়া সমর্থন করা যায় না। আমাদের উপাত্ত থেকে যতটুকু দেখা যায়, ব্যক্তি অধিকারের ধারণার সঙ্গে প্রথাগত এশীয় মূল্যবোধের কোনো বিরোধ নেই।

[মূল লেখাটি *এশিয়ান সার্ভে* মে-জুন ২০১৮ সংখ্যায় ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ভলিউম ৫৮, নম্বর ৩, পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৫৬]

তথ্যসূত্র

১. Freedom House, Freedom on the Net 2015, Washington, DC, October 15, 2015, <https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN%202015%20Full%20Report.pdf>, accessed March 12,2018.

২. Pew Research Center, 'Emerging and Developing Nations Want Freedom on the Internet: Young Especially Opposed to Censorship,' Washington, DC, March 19, 2014, <http://www.pewglobal.org/2014/03/19/emerging-and-developing- nations-want-freedom-on-the-internet/>, accessed March 12, 2018.

৩. Yu-tzung Chang and Yun-han Chu, 'Confucianism and Democracy : Empirical Study of Mainland China, Taiwan and Hong Kong,' Asian Barometer, Working Paper Series 1 (2002): 3–32; Russell J. Dalton and Nhu-Ngoc T. Ong, 'Authority Orientations and Democratic Attitudes: A Test of the "Asian Values" Hypothesis,' *Japanese Journal of Political Science* 6:2 (2005): 211–31; Andrew J. Nathan, 'Political Culture and Regime Support in Asia,' Paper presented at the conference The Future of US–China Relations, USC US–China Institute, Los Angeles, CA, 2007.

৪. Michael D. Barr, 'Lee Kuan Yew and the 'Asian Values' Debate,' *Asian Studies Review* 24:3 (2000): 309–34; Diane K. Mauzy, 'The Human Rights and "Asian Values" Debate in Southeast Asia: Trying to Clarify the Key Issues,' *Pacific Review* 10:2 (1997): 210–36.

৫. Mauzy, 'Human Rights and "Asian Values" Debate.'

৬. Scott L. Goodroad, 'The Challenge of Free Speech: Asian Values v. Unfettered Free Speech: An Analysis of Singapore and Malaysia in the New Global Order,' *Indiana International & Comparative Law Review* 9:1 (1998): 259–318; Kanishka Jayasuriya, 'Understanding "Asian Values" as a Form of Reactionary Modernization,' *Contemporary Politics* 4:1 (1998): 77–91; Fareed Zakaria, 'Culture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew,' *Foreign Affairs* 73:2 (March/April 1994): 109–26.

৭. Amartya Sen, Human Rights and Asian Values (New York: Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1997).

৮. Amitav Acharya, 'Asia Is Not One,' *Journal of Asian Studies* 69:4 (2010): 1001–13.

৯. Neil A. Englehart, 'Rights and Culture in the Asian Values Argument: The Rise and Fall of Confucian Ethics in Singapore,' *Human Rights Quarterly* 22:2 (2000): 548–68.

১০. Clive S. Kessler, 'The Abdication of the Intellectuals: Sociology, Anthropology, and the Asian Values Debate—or, What Everybody Needed to Know about "Asian Values" That Social Scientists Failed to Point Out,' *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 14:2 (1999): 295–312.

১১. William Theodore de Bary, *Asian Values and Human Rights: A Confucian Communitarian Perspective* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).

১২. So Young Kim, 'Do Asian Values Exist? Empirical Tests of the Four Dimensions of Asian Values,' *Journal of East Asian Studies* 10:2 (2010): 315–44.

১৩. Jack M. Balkin, 'Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society,' *New York University Law Review*, 79:1 (2004): 1–55.

১৪. Jack M. Balkin, 'The Future of Free Expression in a Digital Age,' *Pepperdine Law Review* 36 (2008): 427–44.

১৫. John Stuart Mill, *On Liberty* (Longman, Green and Company, 1865).

১৬. Alexander Meiklejohn, *Free Speech and its Relation to Self-Government* (Clark, NJ: Lawbook Exchange, 1948).

১৭. C. Edwin Baker, *Human Liberty and Freedom of Speech* (New York: Oxford University Press, 1992).
১৮. Balkin, 'Future of Free Expression': 427–44.
১৯. David R. Johnson and David Post, 'Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace,' *Stanford Law Review* 48 (1996): 1367–1402; Brian Kahin and Charles Nesson, *Borders in Cyberspace: Information Policy and the Global Information Infrastructure* (Cambridge, MA: MIT Press, 1997).
২০. Lawrence Lessig, *Code: And Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books, 2006).
২১. Ben Wagner, 'Freedom of Expression on the Internet: Implications for Foreign Policy,' *Foreign Affairs* 88 (2011): 4.
২২. Alec Ross, 'Internet Freedom: Historic Roots and the Road forward,' *SAIS Review of International Affairs* 30:2 (2010): 3–15.
২৩. Freedom House, Freedom on the Net 2015.
২৪. Ibid.
২৫. 'World Public Opinion on Freedom of the Media,' <http://www.worldpublicopinion.org/ pipa/pdf/apr09/WPO_ PressFreedom_Apr09_packet.pdf>, accessed March 12, 2018.
২৬. 'Four in Five Regard Internet Access as a Fundamental Right: Global Poll,' *BBC World Service*, March 8, 2010, <http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf>, accessed March 12, 2018.
২৭. Pew Research Center, 'Global Support for Principle of Free Expression, but Opposition to Some Forms of Speech,' Washington, DC, November 18, 2015, <http://www.pewglobal.org/files/2015/11/Pew-Research-Center-Democracy-Report-FINAL-November-18-2015.pdf>, accessed March 12, 2018.
২৮. Chang and Chu, 'Confucianism and Democracy': 1–32.
২৯. Chong-Min Park and Doh Chull Shin, 'Do Asian Values Deter Popular Support for Democracy in South Korea?' *Asian Survey* 46:3 (2006): 341–61.
৩০. Nathan, 'Political Culture and Regime Support.'
৩১. Dalton and Ong, 'Authority Orientations and Democratic Attitudes': 211–31.
৩২. Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, 'The Effect of Confucian Values on Support for Democracy and Human Rights in Taiwan,' *Taiwan Journal of Democracy* 3:1 (2007): 143–54.

৩৩. Christian Welzel, 'The Asian Values Thesis Revisited: Evidence from the World Values Surveys,' *Japanese Journal of Political Science* 12:1 (2011): 1–31.

৩৪. Ming Sing, 'Explaining Support for Democracy in East Asia,' *East Asia* 29:3 (2012): 215–34.

৩৫. Park and Shin, 'Do Asian Values Deter Popular Support for Democracy in South Korea?': 341–61.

৩৬. Chang and Chu, 'Confucianism and Democracy': 1–32.

৩৭. Dalton and Ong, 'Authority Orientations and Democratic Attitudes': 211–31.

৩৮. Michael H. Bond, 'Finding Universal Dimensions of Individual Variation in Multicultural Studies of Values: The Rokeach and Chinese Value Surveys,' *Journal of Personality and Social Psychology* 55:6 (1988): 1009–15; Chang and Chu, 'Confucianism and Democracy': 1–32; Dalton and Ong, 'Authority Orientations and Democratic Attitudes': 211–31; Bryan S. K. Kim, Donald R. Atkinson, and Peggy H. Yang, 'The Asian Values Scale: Development, Factor Analysis, Validation, and Reliability,' *Journal of Counseling Psychology* 46:3 (1999): 342–52.

৩৯. Dalton and Ong, 'Authority Orientations and Democratic Attitudes': 211–31; Kim, Atkinson, and Yang, 'Asian Values Scale': 342–52.

৪০. Welzel, 'Asian Values Thesis Revisited': 1–31.

৪১. Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013).

৪২. Balkin, 'Digital Speech and Democratic Culture': 1–55.

৪৩. Christian Fuchs, 'Web 2.0, Prosumption, and Surveillance,' *Surveillance & Society* 8:3 (2011):

288–309; David Lyon, *The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society* (Cambridge, UK: Polity Press, 1994).

৪৪. Neil Richards, *Intellectual Privacy: Rethinking Civil Liberties in the Digital Age* (Oxford: Oxford University Press, 2015).

৪৫. Dhavan V. Shah, Nojin Kwak, and R. Lance Holbert, '"Connecting" and "Disconnecting" with Civic Life: Patterns of Internet Use and the Production of Social Capital,' *Political Communication* 18:2 (2001): 141–62.

৪৬. Pew Research Center, 'Emerging and Developing Nations.'

৪৭. Ibid.; Pew Research Center, 'Global Support for Principle of Free Expression.'

৪৮. Erik C. Nisbet, Elizabeth Stoycheff, and Katy E. Pearce, 'Internet Use and Democratic Demands: A Multinational, Multilevel Model of Internet Use and Citizen Attitudes about Democracy,' *Journal of Communication* 62:2 (2012): 249–65.

৪৯. Elizabeth Stoycheff and Erik C. Nisbet, 'What's the Bandwidth for Democracy? Deconstructing Internet Penetration and Citizen Attitudes about Governance,' *Political Communication* 31:4 (2014): 628–46.

৫০. Overlapping questions were used to test measurement reliability.

৫১. Stoycheff and Nisbet, 'What's the Bandwidth for Democracy?': 8.

বই আলোচনা

সমকালীন বাংলাদেশের নির্মোহ এক গল্প

প্রতীক বর্ধন

বাংলাদেশ : পলিটিকস, ইকোনমি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি—
ডেভিড লুইস, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

ভূমিকা

ডেভিড লুইসের আলোচ্য বইয়ে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের গড়ে ওঠার ইতিহাস চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান—এসব নিয়ে নানা লেখাপত্র আছে। এ নিয়ে আমাদের গৌরবও কম নয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র হিসেবে আমরা কেমন করলাম, তার নির্মোহ বিশ্লেষণের বড়ই অভাব। এ ক্ষেত্রে উইলিয়াম ভ্যান শেনডেলের *আ হিস্টোরি অব বাংলাদেশ* বইকে প্রথম প্রচেষ্টা বলা যায়। ডেভিড লুইস বলেছেন, তাঁর এ বই শেনডেলের বইয়েরই সম্প্রসারণ।

বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের পরিচিতি বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি বা ঘটনার সাপেক্ষে নির্ধারিত। প্রথমত, স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উঠলে অনেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ হিসেবেই আমাদের চিহ্নিত করেন। দ্বিতীয়ত, অনেকের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশ সমার্থক। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে একসময় বাংলাদেশের নাম ছাপা হতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত দেশ হিসেবে, অর্থাৎ বছরে একবার বা দুই বছরে একবার। তৃতীয়ত, অনেকের কাছে বাংলাদেশের পরিচয় গ্রামীণ ব্যাংক বা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সূত্রে, ক্ষুদ্রঋণের পরীক্ষণ ভূমি হিসেবে। ডেভিড লুইস বলছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত সাড়ে চার দশকে শিশু ও নারীমৃত্যুর হার কমানো, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক সফলতা ও যে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতি

অর্জন করেছে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেটি একরকম অনুচ্চারিত। বইটিতে তিনি সেই বাংলাদেশের চিত্রই নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

লুইস বলছেন, জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নাটকীয় উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেছে। আর উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেন তারই এক আদর্শ প্রতিরূপ। এ ছাড়া বাংলাদেশের অভিবাসীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। এসব সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়া মানেই যেন ভারত-পাকিস্তান। সে তুলনায় বাংলাদেশের পরিচিতি অনেক কম—ব্যাপরটা বিস্ময়কর।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ৪৭ বছরের হলেও এই অঞ্চলের ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছিল ভারতের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এরপর ব্রিটিশ উপনিবেশেরও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল বাংলা। পরবর্তীকালে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে আজকের বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ। ডেভিড লুইস জানাচ্ছেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা, দুটি সামরিক অভ্যুত্থান, গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রত্যাবর্তন উল্লেখযোগ্য। ২০০৭ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় দুই বছর দেশ শাসন করলেও দেশের সেই গণতান্ত্রিক কাঠামো এখনো অক্ষুণ্ন আছে।

ডেভিড লুইসের মতে, এই বইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গুরুত্ব শুধু এই দেশবাসী বা প্রতিবেশীদের কাছে প্রতিপন্ন করা নয়; বরং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তা প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর এই যুক্তির চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে :

প্রথমত, বৈশ্বিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির একীভূতকরণ ও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। এত দিন বাংলাদেশ সস্তা শ্রমের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হাজার হাজার পোশাক কারখানা গড়ে ওঠা যার প্রমাণ। তবে এখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার মজুত এবং তার উত্তোলনে বিদেশি কোম্পানির নিয়োগ নিয়ে যে রকম রাজনীতি হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, জ্বালানিও অত্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাছে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বহুদিন ধরে বাংলাদেশ যথেষ্ট অনুদান পেয়েছে এবং উন্নয়নবিষয়ক চিন্তা ও মনোভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এ ছাড়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) কয়েকটি লক্ষ্য—যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা

অর্জনে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। দেশের এনজিও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম একসময় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দান-অনুদানের টাকা অনেক নয়ছয় হলেও বাংলাদেশ আজ শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও নাইট উপাধিপ্রাপ্ত ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদের দেশ হিসেবেও পরিচিত। ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইউনূস এখন সারা পৃথিবীতে রূপান্তরকামী ধারণা হিসেবে 'সামাজিক ব্যবসার' চিন্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

তৃতীয়ত, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ৯/১১-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ মধ্যপন্থী মুসলিম দেশের তকমা ধরে রাখতে পেরেছে। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল। ফলে দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতা বাংলাদেশ সফর করেছেন; অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দারিদ্র্যের বাইরে বাংলাদেশ কৌশলগত রাজনৈতিক গুরুত্বও লাভ করে। তবে ভারতীয় মহলের অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন, বাংলাদেশ পরবর্তী আফগানিস্তান হতে যাচ্ছে। তবে ২০০৪ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলে তথাকথিত বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে জেমএমবির মতো ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থানের পর এই আশঙ্কা করা অমূলক ছিল না। লেখক নিজেও সেই গোষ্ঠীর তাণ্ডবের কিছুটা স্বচক্ষে দেখেছেন। তবে এত কিছু সত্ত্বেও তিনি মনে করেন, স্যামুয়েল হান্টিংটন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতের যে আশঙ্কা করেছিলেন, তার পাল্টা আখ্যান হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা যায়। তবে লুইস হেফাজতের উত্থান দেখেননি। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেও বলা যায়, বাংলাদেশ এখনো মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ। পাকিস্তানের সঙ্গে তার এখানেই বিভেদ। কারণ, বাংলাদেশের সমাজ এখনো তুলনামূলকভাবে সহিষ্ণু। বাঙালি মুসলিম পরিচয় উপনিবেশ-উত্তর যুগে অনন্য ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তবাদী ধারার সঙ্গে মিলেমিশে এক অনন্য পরিচয়ে গড়ে তুলেছে।

চতুর্থত, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক আগে থেকেই নিয়মিতভাবে হচ্ছে, যা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়লে উপকূলীয় অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ এখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ক্ষেত্রে সামনের সারিতে আছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই প্রথমবার বাংলাদেশের সমস্যা পশ্চিমা জগতের নিজস্ব সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের বিশ্বায়িত হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে, যদিও তা মোটেও নিরীহ নয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্মাণ

বাংলাদেশের গুরুত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে ডেভিড লুইস এই রাষ্ট্রের নির্মাণ ও রূপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরছেন। তিনি বলছেন, স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশ মূলত কৃষিসমাজ ছিল। এর আগে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সাবেক সামন্তীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও তৎকালীন পূর্ব বাংলায় জাতীয় বুর্জোয়া তৈরি হয়নি। কারণ, পুরো পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছে। শিল্পপতিরা প্রায় সবাই ছিলেন অবাঙালি।

স্বাধীনতার পর গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এতে সেখানে মানুষের জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষ দ্রুত শহরের দিকে আসতে শুরু করে। কিন্তু ডেভিড লুইস বলছেন, এই নগরায়ণ প্রথাগত শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে ঘটেনি; বরং কষ্টকর জীবন থেকে মানুষের মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই প্রক্রিয়ার শুরু। তবে ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে দেশে তৈরি পোশাকশিল্প কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে, ওই সময় শিল্পায়নের নজির হিসেবে শুধু এটিকেই উল্লেখ করা যায়। আর এতে আরেকটি ব্যাপার ঘটল তা হলো, শহরে ভাসমান কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে গেল। গ্রামাঞ্চলের কৃষিকাজে যেহেতু নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, সেহেতু ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ার কারণে এই নারীরা শহরমুখী হতে শুরু করেন। এই নারীরাই তৈরি পোশাকশিল্পে কাজ করতে শুরু করেন। স্বাধীনতার পর এটিকে নগরের পরিবেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ডেভিড লুইস। তবে এটিকে আমরা স্বাধীনতার পর দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করব। সমাজে এর বড় প্রভাব আছে।

ডেভিড লুইস লক্ষ করেছেন, দেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের এ দিকটিতে গবেষকেরা এখনো নজর দেননি বলে তাঁর আক্ষেপ। তাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র, সংখ্যা ও বৈচিত্র্য নিয়ে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। লুইসের পর্যবেক্ষণ, স্বাধীনতার আগে-পরে যে বিশ্ববিদ্যালপড়ুয়া ছোট একটি স্থানীয় অভিজাত শ্রেণি তৈরি হয়েছিল, যাঁরা আমলাতন্ত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও পুরোনো ধাঁচের ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, যাঁদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছিল, যাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন, সেই শ্রেণিটি পরবর্তীকালে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গেও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন জড়িত বলে লুইস মনে করেন। ১৯৮০-এর দশকে গ্রামাঞ্চলে কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক খাত গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামাঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলো এসব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই শ্রেণিটি ১৯৯০-এর দশকে নির্মাণ, উৎপাদন ও ক্রমবর্ধমান ওষুধশিল্পের খুচরা বিক্রেতা হিসেবে তার সুবিধা

নেয়। এই শ্রেণিটি উচ্চশিক্ষিত নয়, এরা প্রয়োগবাদী। ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সুবিধাবাদী জোট করতে এদের বাধে না। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এদের তেমন একটা যোগাযোগ নেই। এই শ্রেণিটি মধ্য-ডানপন্থী দল বিএনপির সমর্থক ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এই শ্রেণিটি কলকাতা-শিক্ষিত ভদ্রলোক ও স্থানীয় অভিজাতদের পরিশীলিত সংস্কৃতির ধার ধারে না। এই নব্য ধণিকশ্রেণির যেমন গ্রামেও শিকড় আছে, তেমনি শহরেও। এদের বাস্তবতা অনেক জটিল ও বহুস্তরিক। আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এরাই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

জাতি ও রাষ্ট্র গঠন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, পাকিস্তানের মূল সমস্যা ছিল 'জাতিগত একীভূতকরণের' ঘাটতি। তাঁর বক্তব্য হলো, এতে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে দ্বিমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেখানে জাতীয় আদর্শের সঙ্গে সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একটি নতুন জাতীয় ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে হয়। 'জাতি গঠনের' সঙ্গে রাষ্ট্র গঠনের পার্থক্য চিহ্নিত করে রওনক জাহান বলেন, অনেক উন্নত দেশে রাষ্ট্র গঠনের পরে জাতি গঠিত হলেও বাংলাদেশের মতো দেশকে দুটি কাজ একত্রে করার মতো জটিলতায় পড়তে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন অভিজাতরা রাষ্ট্র গঠনের দিকেই মূলত গুরুত্ব দেন। এতে যা ঘটে তা হলো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও কর্তৃত্ব সংহত করার জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা প্রভৃতি কাজে তার পক্ষে গুরুত্বে দেওয়া সম্ভব হয় না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রে এই দুটি কাজের মধ্যে বেশ দ্রুতই বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেরও একই অবস্থা হলো বলে মত দিয়েছেন ডেভিড লুইস। কুপারকে (২০০০) উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন, আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতারাও স্বাধীনতা অর্জনের পর বুঝতে পারেন রাষ্ট্রক্ষমতা কতটা ভঙ্গুর। সে কারণে তাঁরা মনস্থির করলেন, আগের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেভাবে দ্বাররক্ষকের ভূমিকা পালন করত, তাঁদের নতুন রাষ্ট্রও সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ক্ষমতাকাঠামোর ওপর কর্তৃত্ব রাখতে তাঁরা এটাকেই সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে ধরে নিলেন। ব্যাপারটা হলো, রাষ্ট্র কায়েম করতে গেলে যে বলের প্রয়োজন হয়, সেটা না থাকায় তাঁরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতিকেই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেন। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো, অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্র মৌলিকভাবে দুর্বল হলো এবং তাতে উপনিবেশের শেষ সময়ের সমস্যাগুলো জিইয়ে থাকল।

ফলে সেই পুরোনো আশরাফ-আতরাফ দ্বিবিভাজন থেকে সমাজ বেরিয়ে এল। গড়ে উঠল নতুন এক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় ক্ষমতবান বা উঁচুস্তরের মানুষেরা পৃষ্ঠপোষকতার বিনিময়ে সমাজের নিচুস্তরের মানুষদের শ্রম, সেবা ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। ফলে কালক্রমে এই পৃষ্ঠপোষক-সুবিধাভোগী সম্পর্ক দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ইরিক জ্যানসেন (১৯৮৭) দেখাচ্ছেন, এতে দুই স্তরবিশিষ্ট ক্রমিক এক সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যেখানে এক পক্ষের আরেক পক্ষের জন্য কিছু করার বাধ্যবাধকতা থাকে। এর মধ্যে আবার প্রতিযোগিতাও থাকে, সবাই নিজের মতো করে এই জালটা টেনে বড় করতে চায়।

ডেভিড লুইস ব্যাখ্যা করছেন, সে কারণে বাংলাদেশের সমাজ পৃষ্ঠপোষক-সুবিধাভোগীর এক জটিল ব্যবস্থা ঘিরে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে যেমন জানমালের সুরক্ষার মতো রাজনৈতিক উপাদান আছে, তেমনি ঋণপ্রাপ্তি ও চাকরির মতো অর্থনৈতিক উপাদানও আছে। বলা যায়, এর মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থা আরও সংহত হয়। সে জন্য লুইস বলছেন, এখানে মানুষের পক্ষে আনুভূমিক সম্পর্ক বা রাজনীতি, আত্মীয়তা, সংগঠন ও স্থানীয় সমাজের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও যৌথ উদ্যোগের ওপরও এর প্রভাব আছে। কোচানেক (১৯৯৩ :৪৪) বলছেন, সে জন্য এখানে ব্যক্তিগত কারিশমা, পৃষ্ঠপোষকতা ও দুর্নীতির ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব খুবই প্রকট।

বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার জন্য দুটি বিষয় দায়ী : একটি হলো শ্রেণিস্বার্থ, আরেকটি পৃষ্ঠপোষক-সুবিধাভোগী নেটওয়ার্ক (খান ২০০০)। প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থে এই দুটি বিষয়কে এক করে ফেলে। এই প্রক্রিয়ায় তারা যে কাঠামো গঠন করে, তাতে সম্পর্ক ও যোগাযোগের নানা রকম মাত্রা থাকে। এই বহুস্তরিক কাঠামোয় সবার ওপরে থাকে রাজনৈতিক দল। তারা তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণিকে পৃষ্ঠপোষকতার জটিল এক সূত্রে জড়িয়ে ফেলে, যা এই কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থার গোড়া আবার সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। এতে ঐক্য গড়ে ওঠে সুবিধাপ্রাপ্তদের বৃহত্তর গোষ্ঠীতান্ত্রিক সুবিধার ভিত্তিতে। কিন্তু একবার তা গড়ে উঠলে আবার ভেঙে পড়তেও সময় লাগে না। কারণ, একটা সময় এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সব গোষ্ঠীর পক্ষে সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়। এই বিজয় অর্জন হিসেবে অনেক বড় হলেও স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষে ক্ষমতায় আসার পর সেই দলের ঐক্য খান খান হয়ে ভেঙে পড়তেও সময় লাগেনি। কারণ, সম্পদ ছিল সীমিত,

আর সেই সীমিত সম্পদের ভাগ নিতে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ডেভিড লুইস বলছেন, এ কারণেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এত দলাদলি; যার মূল কারণ হচ্ছে সুবিধাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই এখানে শক্তিশালী শ্রেণিগত ঐক্য সেভাবে দেখা যায় না, যা উপমহাদেশের অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়। একসময়ের ভূস্বামী শ্রেণির মধ্যে বা আজকের পুঁজিপতি কোনো শ্রেণির মধ্যেই এই ঐক্য দেখা যায় না, তাই দলবদলও এখানে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

এ বিষয়ে ডেভিড লুইসের অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। দেশের গ্রামাঞ্চলে যে প্রকৃতপক্ষে আদর্শভিত্তিক বা সহমর্মিতাভিত্তিক আন্দোলন নেই, তার কারণ হিসেবে তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এমনকি উপনিবেশের যুগে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মতো যেসব আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার ব্যাপকতাও তেমন একটা ছিল না। লুইস বলছেন, এসব আন্দোলনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভিত্তিক ছিল।

বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বাররক্ষকের ভূমিকায় আমাদের রাষ্ট্র যা-ও কিছুটা সফল, জাতি হিসেবে এখনো আমরা শতধাবিভক্ত। সামরিক বাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র এসব এখন নিজেদের স্বার্থে হলেও কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। জাতিগত ঐক্য নেই বলেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম ঐকমত্য নেই। এই সূত্র খুঁজতে গিয়ে লুইস ইতিহাসের অনেক পেছনেও গেছেন।

তবে এই জাতির একটি জায়গায় ঐক্য আছে, তা হলো, স্বার্থের ঐক্য। জো মিডগেল ও সারাহ হোয়াইট অবশ্য একটু ভিন্নভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বাংলাদেশকে 'দুর্বল রাষ্ট্র' ও 'সবল সমাজ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, বিভিন্ন সরকার যে ধারাবাহিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা পুনর্গঠন, যৌতুক বন্ধ ও খাসজমি বিতরণের চেষ্টা করেছে, তার কোনোটিই শেষমেশ আলোর মুখে দেখেনি। কারণ, সমাজের শক্তিশালী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোয় ন্যূনতম আঁচড়টা লাগতে দেয়নি। আঁতে ঘা লাগলে এরা হরতাল ও ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচি দিতে পারে। আর নিরীহ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে এরা বড়জোর বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাজে লাগতে পারে, এর চেয়ে ভালো কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের ভূমিকা বোঝাতে লুইস ম্যাকগ্রেগরের দ্বারস্থ হয়েছেন। ম্যাকগ্রেগর বলেন, পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র নিজেই প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়। আর ব্যক্তি পরিসরে সে নিজে 'চূড়ান্ত পৃষ্ঠপোষক' হয়ে ওঠে।

বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সমাজ

রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারটা বাংলাদেশে এখনো প্রক্রিয়াধীন, সে জন্য এখানে অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানের কাজ করার প্রভূত সুযোগ আছে। ঔপনিবেশিক যুগেও এই অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক পেশাদার গোষ্ঠীর আসা-যাওয়া ছিল। পেশাদার গোষ্ঠী থেকে ধর্ম প্রচারক সবাই এখানে এসেছে। জানা যায়, সুফি-দরবেশদের দয়া-দাক্ষিণ্য ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার যে বিশাল কর্মক্ষেত্র গড়ে ওঠে, তা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিসরে নতুন পরিচিতি এনে দেয়; বিশেষ করে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের কথা এখানে সবার আগে বলতে হয়।

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে আমাদের রাষ্ট্রের সামাজিক সেবা দেওয়ার সক্ষমতা ছিল না বলেই এসব সংস্থার উদ্ভব, যা আগেও বলা হয়েছে। এসব সংস্থার মধ্যে উল্লিখিত দুটি সংস্থা এত বড় হয়ে যায় যে তা সরকারের কোনো কোনো বিভাগ বা সংস্থার সমতুল্য হয়ে যায়। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশে ২ লাখ ৬ হাজার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আছে এবং মোট দেশজ উৎপাদনে তাদের অবদান ৬ থেকে ৮ শতাংশ।

দেশে এদের ভূমিকা নিয়ে বিচিত্র মনোভাব দেখা যায়। একদল মনে করে, ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের মতো সংস্থা না থাকলে মানুষ না খেয়ে থাকত। আবার আরেক দল মনে করে, এদের উপস্থিতি ও বিশালত্ব আদতে রাষ্ট্রের দুর্বলতার কথাই আবারও জানান দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ২০০৬ সালের বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুসারে, সে সময় দেশের ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে এই খাতের সেবা নিয়েছে—ঋণ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা। এ কথা অনস্বীকার্য, দেশে শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মাতৃত্বকালীন মৃত্যু, টিকাদান কর্মসূচির সফলতা, পুষ্টির উন্নয়ন ও সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে এসব সংস্থার ভূমিকা আছে। এ ছাড়া নারীদের ঘর থেকে বের করে কর্মক্ষেত্রে আনার পেছনেও এসব সংস্থার ভূমিকা আছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বাঙালি অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু[১] বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে নারী ক্ষমতায়নকেই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাই দেশের উন্নয়নে এসব সংস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও তাদের মাধ্যমে দাতাগোষ্ঠীর সক্রিয়তা বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এ ছাড়া দেশে পূর্ব ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ধাঁচে নাগরিক সমাজের ধারণাও তৈরি হয়েছে এই সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, যা নিয়ে দেশে এখন বিস্তর সমালোচনা আছে। ডেভিড লুইস এই বিষয়গুলো বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন, যা নিঃসন্দেহে আগ্রহী পাঠকের খোরাক মেটাবে।

তবু উন্নয়ন ও তার প্যারাডক্স বা আপাত-স্ববিরোধ

দেশের এই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে গত ১০ বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে এবং শেষ দুই বছরে যে তা ৭ শতাংশের ঘরে চলে গেছে, তা রীতিমতো বিস্ময়ের। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ ও নীতি বিশ্লেষকেরা একে প্যারাডক্সিক্যাল বা আপাত-স্ববিরোধী আখ্যা দিচ্ছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত বলছেন, অপশাসনের মধ্যেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হতে পারে, যদি বিবদমান ক্ষমতাশালী অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবৃদ্ধির ধরন ও তোফা বিতরণের পদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্য না থাকে (খান ২০১৩; হাসান ২০১৩)। অনেকের কাছে তা আবার গোলকধাঁধার মতো। এই মানুষেরা ভেবে পান না, এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থায় কীভাবে গরিববান্ধব ও মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ হয়; মানে যে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো এত দুর্নীতিগ্রস্ত ও রাজনীতিতে সহিংসভাবে একাই সব পেতে চায়, তারা কেন দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অনুক্রমিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে। ফলে উন্নয়নশাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে গত দশকগুলোতে একটি প্রশ্নই ঘুরেফিরে এসেছে, এ রকম দুর্বল শাসনব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে মানব উন্নয়নে অগ্রণী হলো? বাংলাদেশ যদি পারে, অন্যরাও কি পারবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নওমি হোসেনের[২] দ্বারস্থ হতে হলো, যদিও ডেভিড লুইসও অনেকটা তাঁর মতো করেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তবে জন্মসূত্রে বাঙালি হওয়ায় নওমি হোসেনের পক্ষে বোধ হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একদম গহিনে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি বলছেন, এই স্ববিরোধী উন্নয়ন প্রপঞ্চের কেন্দ্রে আছে বিভিন্ন ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর অভিন্ন চিন্তা বা ঐকমত্য। তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের ভোলা সাইক্লোন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ ও ১৯৭৪ সালের বন্যার ত্রিমুখী আক্রমণ শাসকগোষ্ঠীসহ সবার চিন্তায় এক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এরপরই মূলত গরিবমুখী সরকারি উদ্যোগ গৃহীত হয়। তার ফল হিসেবে দেখা যায়, বিপর্যয় মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন যথেষ্ট প্রস্তুত।

নওমি হোসেন এই আপাত-স্ববিরোধী উন্নয়ন প্রঞ্চের তিনটি মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর শাসকশ্রেণি বুঝতে পারল, মৌলিক সামাজিক সুরক্ষা ও মানব উন্নয়নের ওপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। সে কারণেই দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিল। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এই মানুষদের সমর্থন আদায়ে শাসকশ্রেণি এদের মৌলিক সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়। তৃতীয়ত, সব দলই বাজার ও গরিবমুখী অর্থনীতি ও মানব উন্নয়নধর্মী কৌশল গ্রহণ করে। বিবদমান দলগুলো বুঝতে পারে, উন্নয়নের ওপরই তাদের অস্তিত্ব নির্ভর

করছে। উন্নয়নের যূপকাষ্ঠে সংস্কৃতি, আদর্শ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সবই বিসর্জন দেওয়া যায়; অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যূনতম এটুকু ঐকমত্য হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নীতির ধারাবাহিকতা থাকার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।

শেষ কথা

এসব আলোচনায় একটি দিক উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। সেটি হলো, মানুষের উদ্যোগ। দুর্ভিক্ষের স্মৃতি মানুষের সামষ্টিক মননে এখনো জ্বলজ্বল করছে। ফলে সেই দুঃখকষ্ট কাটিয়ে উঠতে এ দেশের মানুষের উদ্যোগ-উদ্যম সত্যি চোখে পড়ার মতো। আজ বিপুলসংখ্যক মানুষ নিজের মতো করে কিছু না কিছু করছে, যদিও তার বেশির ভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে। নিম্নমধ্যবিত্ত চাকরির বাইরেও উপার্জনমূলক কিছু করছে। এর সঙ্গে নারীদের এগিয়ে আসাও সমাজকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

সে কারণে মধ্যবিত্তের নতুন এক ধরন সৃষ্টি হচ্ছে। নগরায়ণ প্রক্রিয়ার গতি দেখলেই তা বোঝা যায়, কিন্তু এই নগরবাসীরা গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে নয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই নিজের অবস্থার উন্নতি করতে শহরে এসেছে। ফলে তাদের আচরণ সেই ধ্রুপদি মধ্যবিত্তের মতো নয়, তাদের মতো অতটা শিক্ষিতও এরা নয়। তারা টাকা রোজগার করে গ্রামে পাঠায়, সেখানে সম্পদ গড়ে তোলে। ২০১৫ সালের বিআইডিএসের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে দ্রুত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হচ্ছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশাল অংশ চাকরি করে, তারা এখন ফ্ল্যাটে থাকে কিংবা জমির মালিক। এরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে, টাকাপয়সা রাখে ব্যাংক হিসাবে। সব মিলিয়ে তখন বাংলাদেশের ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত ছিল। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মধ্যবিত্ত হবে[৩]। এই শ্রেণি যেমন ধর্মকর্ম করে, তেমনি সাধারণীকরণ না করেও বলা যায়, দুর্নীতির সুযোগ পেলেও তারা ছাড়ে না। এদের অনেকের সন্তান ইংরেজি মাধ্যম বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এই শ্রেণির বেশির ভাগই নাটক-সিনেমা দেখতে যায় না। বইমেলায় যায় না। গেলেও সেটা যেতে হয় বলে। কারণ, তাদের অন্তঃকরণটা এখনো আলোকিত হয়নি।

ডেভিড লুইস যেমন বলেছেন, সেই সূত্রে বলা যায়, নতুন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ওপরই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। হেফাজতে ইসলামের মধ্যে এই নতুন মধ্যবিত্তের ছায়া দেখা যায়। নানা উদ্যোগ-উদ্যমের মধ্য দিয়ে এরা উঠে আসছে। পুরোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণি কীভাবে এই নতুন শ্রেণিকে গ্রহণ করে বা রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে কী ভূমিকা গ্রহণ করে, তার ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র

১. Kaushik Basu, 'Why Is Bangladesh Booming?,' *Project Syndicate*, available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/bangladesh-sources-of-economic-growth-by-kaushik-basu-2018-04?barrier=accesspaylog

২. Naomi Hossain, *The Aid Lab: Understanding Bangladesh's Unexpected Success*, Oxford University Press, 2017.

৩. বিআইডিএস, 'সাড়ে তিন কোটি মানুষ এখন মধ্যবিত্ত,' দৈনিক *প্রথম আলো*, ০৬ নভেম্বর ২০১৫। দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/675838/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7-%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4

প্রথমার বই সারা বছর সেরা বই

নতুন বই

- **বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি** ৳ ৪৫০
  এম এম আকাশ
- **রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র ১৯৫১**
  পাকিস্তানের প্রথম সেনা অভ্যুত্থান-প্রয়াস
  আকবর খান, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ও সাজ্জাদ জহিরের ভূমিকা ৳ ২৫০
  সোহরাব হাসান
- **বিশ্বায়ন : ইতিহাস ও গতিধারা** ৳ ৪৫০
  বদরুল আলম খান
- **বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী** ৳ ৭৫০
  কামরুদ্দীন আহমদ
- **ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন** ২য় মু. । ৳ ৩০০
  আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল
- **নজরুলের সংগীত জীবন** ৳ ৪৫০
  শাহীনুর রেজা
- **সাজা মাত্র ৩ শতাংশ : ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল** ৳ ৩০০
  সম্পাদনা : কুব্‌রাতুল-আইন-তাহমিনা ও প্রণব ভৌমিক
- **Bangladesh : Politics, Economy and Civil Society** ৳ ৫০০
  David Lewis
- **Social Classes and Social Stratification in Bangladesh** ৳ ৩০০
  Syed Zahir Sadeque

প্রথমা

প্রথমা • ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা । ৮১৮০০৭৮-৮১
• ৪৩-৪৪ আজিজ সুপার মার্কেট,শাহবাগ, ঢাকা । ৯৬৬৪৮২৫

লে খ ক প রি চি তি

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশের সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান* ২০১৫, *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ* ২০১৭ এবং *বিশ্বায়ন : ইতিহাস ও গতিধারা* ২০১৮ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আলী রীয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর। তিনি ২০০৭ সাল থেকে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ২০০২ সালে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড ও সাউথ ক্যারোলিনায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি লন্ডনে বিবিসিতে সাংবাদিকতা করেছেন পাঁচ বছর। ২০১৩ সালে ড. রীয়াজ ওয়াশিংটনের উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারসে পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতি, মাদ্রাসাশিক্ষা, রাজনৈতিক ইসলাম এবং সহিংস উগ্রবাদ। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *আনডায়িং ইস্যুজ* (২০১৮), *লিভড ইসলাম অ্যান্ড ইসলামিজম ইন বাংলাদেশ* (২০১৭), *বাংলাদেশ : আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিনস ইনডিপেনডেন্স* (২০১৬)। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো *ভয়ের সংস্কৃতি : বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (২০১৪)।

ফেই শেন ও লোকমান সুই

ফেই শেন হংকংয়ের সিটি ইউনিভার্সিটির মিডিয়া ও কমিউনিকেশন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। লোকমান সুই হলেন হংকংয়ের চায়নিজ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশনের সহকারী অধ্যাপক।

ড. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক প্রধান। ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলার, সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার এবং জাপান ফাউন্ডেশন ফেলো ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই *Role of Opposition in Bangladesh*, *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র : রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স*। সম্পাদনা করেছেন *বাংলাদেশে নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, *Political Management in Bangladesh : Crisis of Political Development.* এ ছাড়া দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সংকলন ও জার্নালে তাঁর গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও তুলনামূলক রাজনীতিতে নর্দার্ন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজে শিক্ষকতা করছেন। প্রকাশনা : *Water for Poor Women: Quest for an Alternative Paradigm* (Lanham: Lexington Books, 2013)। লেখালেখির বিষয় : গণতন্ত্রায়ণ, ইসলামি মতাদর্শ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা।

মোস্তাফিজুর রহমান

গবেষক ও সাবেক শিক্ষক। বর্তমানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে পিএইচডি করার পর দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা

জীবন শুরু করেন। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের অধীনে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেছিলেন। তাঁর গবেষণাকর্ম দেশে-বিদেশে গ্রন্থাকারে ও জার্নাল প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সরকার-গঠিত জাতীয় কয়লানীতি কমিটি, রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন এবং ট্রানজিট ও কানেকটিভিটি কমিটির সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক রহমান বাংলাদেশের চলমান সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১-এর অর্থনীতিবিদ প্যানেলের সদস্য। এ ছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য।

প্রতীক বর্ধন

সাংবাদিক ও অনুবাদক। বর্তমানে দৈনিক *প্রথম আলোর* সহসম্পাদক পদে নিয়োজিত। অনুবাদের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত কলামও লিখে থাকেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাস।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুইশত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চারশত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

প্রতিচিন্তায় গণতন্ত্র

১ম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১)

- বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ও গণতন্ত্র **— নুরুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব **—নজরুল ইসলাম**

২য় সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১)

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দুই ব্যক্তির ছায়া—**মিজানুর রহমান খান**
- একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের নতুন চ্যালেঞ্জ—**এম এম আকাশ**

৩য় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১২)

- বাংলাদেশে গণতন্ত্র : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ—**আলী রীয়াজ**

৪র্থ সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩)

- বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?—**মির্জা হাসান**

৫ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩)

- গণতন্ত্র, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট—**হোসেন জিল্লুর রহমান**
- রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত **—আল মাসুদ হাসানউজ্জামান**

৬ষ্ঠ সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪)

- বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো **—বার্ট সুইকেন্স ও আইনুল ইসলাম**

৭ম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৪)

- নবধারার নাগরিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ—**মহিউদ্দিন আহমদ**

৮ম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪)

- গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট—**সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
- মওদুদ আহমদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটি মূল্যায়ন (বই আলোচনা)—**মিজানুর রহমান খান**

৯ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪)

- রাজনীতিতে দায়িত্বশীলতা ও গণতন্ত্রের শর্ত (বই আলোচনা)—**হাসান শফি**

১০ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫)

- বাংলাদেশে নতুন ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল—**আলী রীয়াজ**

১১তম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৫)

- বাংলাদেশ : যেখানে গণতন্ত্রের রং ধূসর—**বদরুল আলম খান**

১৩তম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫)

- স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও গণতন্ত্র—**মিজানুর রহমান খান**
- ভয়ের সংস্কৃতির শিকড়-সন্ধান (বই আলোচনা)—**রেজাউল হক**

১৬তম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬)

- বাংলাদেশে গণতন্ত্র : এলিট বনাম জনগণ—**বদরুল আলম খান**

১৮তম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭)

- বাংলাদেশে সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল?—**আকবর আলি খান**

২০তম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭)

- বাংলাদেশের রাজনীতি, বিকাশমান মধ্যবিত্ত এবং কয়েকটি প্রশ্ন—**আলী রীয়াজ**

২২তম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮)

- মূল্যবোধের রূপান্তর : জনযুক্তিচর্চার আকাল ও পুনরুজ্জীবন—**রেহমান সোবহান**
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা—**ড্যানিয়েল এস লেন**

অন্যান্য লেখা পড়তে ঘুরে আসুন প্রতিচিন্তার ওয়েবসাইট :
https://www.prothomalo.com/protichinta